আনন্দধারা

সমরেশ বসু

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

শ্রীবসন্ত পোত্‌দার

প্রীতিভাজনেষু

আমি জানি, আজকাল আমাকে অনেকেই, বিবেকবুদ্ধিহীন, হৃদয়হীন, অহংসর্বস্ব কিন্তু অত্যন্ত জনপ্রিয় গায়ক বলে মনে করে। কথাটার মধ্যে কতখানি সত্য আছে, আমি নিজেও সে-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয়াচ্ছন্ন। তবে বোধহয় স্বীকার করাই ভাল, বাইরে থেকে আমার আচার-আচরণ কথাবার্তায় তাই মনে হয়।

কিন্তু এগুলো, অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিহীনতা, হৃদয়হীনতা, অহংসর্বস্বতা কাদের মধ্যে জেগে ওঠে? যারা খুব আত্মসন্তুষ্ট, সুখী মানুষ, তাদের মধ্যে? অথচ নিজের কাছে অকপটে স্বীকার করতে পারি, সন্তুষ্টি, সুখ, এসব কোন বোধই আমার নেই। কখনো একেবারেই ছিল না, এমন বলতে পারি না। গায়ক হিসাবে যখন আমি শ্রোতাদের কাছে 'প্রতিশ্রুতিবান' আখ্যা পেয়েছিলাম, তখন এক রকমের আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করেছি। প্রতিশ্রুতিবান থেকে যখন ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিলাম, জনপ্রিয়তার সোপানে পা দিয়েছিলাম, তখনকার গৌরববোধটাকে গর্ব বা অহংকারই বলা চলে। এবং নিজেকে সুখীও বোধ করেছি। মনে করতাম, সেই হল প্রকৃত সুখ। আমি সুখী।

অথচ বলতে হয়, সে-সময়টাকে আমার প্রতিভার মধ্যগগন কোন রকমেই বলা যায় না। উন্মেষের কাল বলা যায়। বরং তখন আমার আচরণ ছিল অন্যরকম। সেই সময় আমি যত বড় ওস্তাদ গায়ক নই, তত বড় ওস্তাদ গায়কের ভাবভঙ্গি অনুকরণ করতাম। মিতভাষী ছিলাম, স্মিত হাসি থাকত আমার মুখে, কিন্তু বজায় রাখতাম একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ। যেন, আমি যত বড় গায়ক, তার চেয়ে বেশি দার্শনিক। গায়কের থেকে সঙ্গীতজ্ঞ ভাব দেখাবার চেষ্টা করতাম। যেন, আমি কেবলমাত্র গায়ক নই, আমার একটা দর্শন আছে, আর সেই দর্শনকে গানের মাধ্যমে প্রচার করে আমি একজন 'প্রফেট' হতে চলেছি।

আসলে নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খান সাহেব, যিনি আমার গুরু ছিলেন, আমার ওস্তাদ, আমার থেকে কম করে পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়সের বড়

ছিলেন, আমি বাইরের লোকের সামনে, (ওস্তাদজীর সামনে কখনোই না।) তাঁর মতই ভাব-ভঙ্গি আচার-আচরণ করতাম। মূলে, তাঁকে সেই সময়ে, এখন থেকে বিশ বছর আগের কথা, আদৌ বুঝতেই পারতাম না। তাঁর পায়ের কাছে বসে, আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে গান শিখেছি। কিন্তু নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খান যে কী ব্যক্তি, সংসারের কোথায় তাঁর অবস্থিতি, তা আমার অনুভবযোগ্যই ছিল না।

এখন সেসব কথা ভাবলে হাসি পায়। আর ভেবে খুবই লজ্জা হয়, যাঁদের দেখবার চোখ ছিল, তাঁরা আমার তৎকালীন আচার-আচরণ দেখে, কাকের ময়ূরের পুচ্ছধারণ দেখে, মুখ টিপে হাসতেন। একটা বয়সে সব ছেলেকেই অকালপক্ব বিশেষণটা শুনতে হয়। সময়টা কৈশোরোত্তীর্ণের সময়। তখন গলায় ধরে বয়সা। হারমোনিয়মের রীডে কর্ডের মতো তার গলার স্বরে তখন সুর বেসুরের দোআঁশলা আওয়াজ। সে তখন ছোটদের মতো কথা বলতে পারে না, অথচ বড়দের মতো কথা বলতেও শিখে ওঠে না। তখন তার বালকোচিত আচরণ অভিভাবকদের ভাল লাগে না। আবার বড়দের মতো কথা বললে, বিরক্ত লাগে।

কিন্তু ওসব হল, বালকদের বেড়ে ওঠার বয়সোচিত লক্ষণ। আমার অকালপক্কতার অবচেতনে থাকত, মূঢ় অহংকার, বুদ্ধিহীন সন্তুষ্টি। তলে তলে পোষণ করতাম একটা সুখ। আত্মসুখ। না জানি আমি কী হলাম। তখনকার অবস্থাটাকে যদি উন্মেষের কাল বলি, তা হলে এখন আমি কোন্ গগনে? বোধহয় সারা গগন ছড়িয়েই আমি এখন বিস্তৃত। কিন্তু সেই সন্তুষ্টি, সুখের বোধ কোথায় গেল? এখন আমি আবার আগের মতো মূঢ় হতেও রাজী আছি। হে গুরু, আবার আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই অল্প বয়সের অপরিপক্বতা, সেই সন্তুষ্টি সুখবোধ।

হায়, গুরু নাসিরুদ্দিন খান আর বেঁচে নেই! বেঁচে থাকলেও আমাকে আর তিনি সেই পুরনো দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন না।

মনে পড়ছে, একদিন গভীর রাত্রে তিনি ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আমি কিঞ্চিৎ জানতাম। তিনি মনে-

প্রাণে এমনই শিল্পী ছিলেন, রমজানের মাসে রোজা করতেও ভুলে যেতেন। খাবার হয়তো খেতেন না, কিন্তু মস্ত বড় গুণাহ্, সুরাপান করতেন, মুখ ভরে পান চিবোতেন। কিন্তু আজ থেকে বছর পনেরো আগে, তাঁকে যে গভীর রাত্রে কাঁদতে দেখেছিলাম, সেটা কোন পারিবারিক কারণে না। সামান্য একজন তয়ফাওয়ালী, কয়েকজন প্রায় সমকক্ষ গায়কের সামনে তাঁকে খারাপ ভাবে ঠাট্টা করেছিল। গুরু জানতে পেরেছিলেন, একজন ওস্তাদ গায়ক কৌশল করেই, তয়ফাওয়ালীকে দিয়ে, সকলের সামনে তাঁকে অপমান করিয়েছিলেন।

গানের জগতের ইতিহাসের গতিও সোজা আর মসৃন না। বড় জটিল আর সর্পিল। নীচতা দীনতা আত্মম্ভরিতা কুটিলতা হিংস্রতা, সবই সেখানে বর্তমান। তাঁকে কাঁদতে দেখে, আমি অত্যন্ত বিভ্রান্ত আর বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করবারও সাহস ছিল না। তিনি আমাকে আগের দিন নির্দেশ দিয়েছিলেন, পরের দিন সন্ধ্যাবেলা যেন আমি তাঁর বাড়ি আসি, এবং তিনি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করি।

গুরুর নির্দেশ, মানে নির্দেশ; সন্ধ্যাবেলায় অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। করেছিলাম। তিনি ফিরে এসেছিলেন রাত্রি দুটোর পরে। না, আমি তখনো এখনকার মতো মদ্যপান করতে শিখিনি। অতএব মদ খেয়ে, মাতাল হয়ে ঘুমিয়েও পড়িনি। অন্যান্য সাকরেদরা চলে গিয়েছিল। নোকর খানসামারাও আশপাশের ঘরে শুয়ে পড়েছিল। প্রভু বাড়ি ফিরলে উঠবে।

গুরু এসে দেখেছিলেন, আমি হারমোনিয়াম নিয়ে, খুব আস্তে আস্তে বাগেশ্রীতে আলাপ করছিলাম। হয়তো থেকে গিয়েছিলাম বলেই, নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের কান্নারও সাক্ষী থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখে, অবাক হয়েছিলেন, 'কী রে বেটা বিশু (আমার নাম বিশ্বরূপ), তুই এত রাতে এখানে বসে আছিস?

আমি বলেছিলাম, 'ওস্তাদজী, আপনি যে আমাকে সন্ধ্যে থেকে এখানে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন ?'

'তাই নাকি ? তোবা তোবা ! একদম ভুলে গিয়েছি রে বিশু বেটা।' তিনি খাটের ওপর আমার পাশেই বসে পড়ে, আমারই আলাপের সুর নিজের গলায় গুনগুনিয়ে উঠেছিলেন, এবং হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন। আর আমাকে সেই ঘটনা শুনিয়ে, সেই রাত্রেই তিনি আমার কপালে যেন নতুন লিখন লিখে দিয়ে বললেন, 'শোন্ বেটা বিশু, তুই একদিন বড় ওস্তাদ হবি। আমার মর্জি না, খোদার মর্জি। তুই খুব বড় ওস্তাদ হবি, বহুত বড়লোক হবি, কিন্তু জানবি, অনেক অপমান আর লাঞ্ছনা চিরকাল সহ্য করে যেতে হবে। সুখের চিন্তা মনেও আনিস না। সুখ কখনো পাবি না। অওরতের পায়রার মতো বুকে মুখ রেখেও কাঁদতে হবে। কেন বল্ তো বেটা ? তুই বহুত বড় হবি। কিন্তু মনে আনন্দ রাখিস। কাঁদিস, তবু খোদাতালাকে, ভগবানকে ডেকে, আনন্দে থাকিস।'...

তাঁর প্রত্যেকটি কথাই দৈববাণীর মতো ফলেছে। ফলেনি শুধু একটি বিষয়। আনন্দ। নেই। নেই সে আমার ধারে-কাছেও। আমার বুক-ভরা জ্বালা, অন্তর-ভরা ক্রোধ, প্রাণ-ভরা ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ। আমাকে তো সবাই গর্বিত অহংকারী ভাববেই। সুখের স-এর সন্ধান পেলাম না। তার যে কী স্বরূপ, তাও জানি না। কিন্তু এই স্থূল জগতে না পেলাম কী ? সবই তো পেয়েছি। তবে ?

আমি এখন এই যে একটি রেলগাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরায় চলেছি, আমার সঙ্গীরা—যারা আমাকে নিয়ে চলেছে এই রাত্রের গাড়িতে, চার বার্থের একটি কামরায়, যারা কেউ আমাকে মদ ঢেলে দিচ্ছে, কেউ আমার পা টিপে দিচ্ছে, কেউ পানের খিলি, সিগারেট বাড়িয়ে দিচ্ছে, তারা সবাই আমাকে কী ভাবে, আমি জানি। আমি

ওদের কাছে একটা পাথরের বিগ্রহের মতো সুন্দর, কঠিন, প্রাণহীন। অবিশ্যিই সেটা মানুষ হিসাবে। গায়ক হিসাবে না। গায়ক হিসাবে আমি ওদের ভাষায় 'জাদুকর।'

আমার থেকে বয়সে ছোট এই সব তরুণের দল, তথাকথিত ভাষায় যাকে বলে 'ভক্ত', এরা তাই। অন্ধ ভক্তও বলা যায়। আর ভক্তরাই অবতারের স্রষ্টা। অবতার সম্পর্কে বিচিত্র সব উপাখ্যানের স্রষ্টাও এরাই। সারা দেশ জুড়ে আমার এরকম অগণিত ভক্ত আছে। আমি এদের অনেকের ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু আমি জানি, আধুনিক কালে অবতার মানেই ভূত। তবে এ ভূতটার চেহারা ঘাড় মটকানো মারমুখো না। এ ভূতটার আজব সব কাণ্ড-কারখানা। সে একটি আজব জীব। কত বিচিত্র গল্প-কাহিনী যে তাদের নামে রটানো হয়, তার ইয়ত্তা নেই। তার কোন সত্যি-মিথ্যা নেই। লোকেও অনায়াসে সে সব বিশ্বাস করে নেয়।

আমাদের জগতে ভগবানের ভক্ত বলে কিছু নেই। আছে ভক্তের ভগবান। এটা যে কত বড় ট্র্যাজেডি, তা আমিই জানি। সে জন্য আমি ভক্তদের সম্পর্কে সাবধান থাকি। ওদের হাতে আত্মসমর্পণ মানেই, শিল্পী খতম। ওদের কাছে থেকেও, আসলে ওদের থেকে লক্ষ যোজন দূরে থাকি আমি। ওরা আমার কূলকিনারা পায় না। সেইজন্যই বলছিলাম, আমি ওদের কাছে একটা পাথরের বিগ্রহ ছাড়া কিছু না।

আসলে, আমি ওদের চিনি না, বুঝি না। ওরাও আমাকে আদৌ চেনে না, বোঝে না। ওরা কী ভাবে? আমি বড় সুখী মানুষ? স্বাভাবিক। আমার এত জনপ্রিয়তা, আমার সৌভাগ্যও তো ওদের কাছে রূপকথার মতো। অথচ আমি তো জানি, আমি কী। আদর যত্ন খাতির তোষামোদ খোসামোদ, সবই আমাকে বিরক্ত করে, ক্রুদ্ধ করে। এই যে ওরা রাত্রের চলন্ত ট্রেনে আমার এত সেবা করছে, ওরা এই ভেবে খুশি হচ্ছে, আমি নিশ্চয় যথেষ্ট আপ্যায়িত বোধ করছি। আমার যে এসব ভাল লাগে না, তা ওদের বলতে পারব না, বোঝাতেও

পারব না। খুশির ভাব দেখিয়ে, আমি মদ্যপান করছি। ওরা যে পান না করছে, তা না। ভাবছে, আমি টের পাচ্ছি না। মাতাল হয়ে পড়ছি, নিজের মধ্যে ডুবে আছি, অতএব ওদের কিছুই আমি লক্ষ করছি না।

মাতাল আমি অবিশ্যি হতে চাই। খুব তাড়াতাড়ি মাতাল হয়ে, অচৈতন্য হয়ে পড়তে চাই। তা হলে, এদের এই মূঢ় সেবা-যত্নের হাত থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, আমি মাতাল হতেও পারি না। মদ্যপান করে, মাতাল হওয়ার সৌভাগ্য থেকেও আমি বঞ্চিত হয়েছি। শরীরের ভিতরে কোথায় কী সব পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, স্বাভাবিকতা বলে সেখানে আর কিছু নেই। মাতালের পরিবর্তে আমি আজকাল বরং দাঁতাল হয়ে উঠি। এই সব ভক্তের দল কি জানে, ওদের এখন আমার কাছ থেকে মেরে তাড়াতে ইচ্ছা করছে ?

জানে না। ওরা জানে না। আমিও জানাই না। এটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছি, এক ধরনের নির্বিকল্প সমাধি। যা খুশি বলে যাও, যত হৈ-চৈ কর, আমি আপন মনে থাকি। ব্যতিক্রম কি কখনো হয় না ? নিশ্চয়ই হয়। অনেক সময় ক্ষ্যাপা রুদ্ররূপ ধারণ করি। আর তখন সবাই অবাক হয়। ব্যথিত হয়।

সত্যিই তো, আমিই বা এমন করি কেন ? আমার মনের মধ্যেই বা এরকম হয় কেন ?

সে-কথাটা আমি নিজেও জানি না। যেমন জানি না, ওস্তাদজীর কথিত আনন্দের বিষয়। কী সেই আনন্দ ? কেমন করে তা পাওয়া যায় ? তিনি কি পেয়েছেন ? নাকি সে সব কেবল মুখের কথা ?

আমার মনটা হীনতায় ভরে উঠছে। মনে মনে কান মলে, ওস্তাদজীর মুখ স্মরণ করে, ক্ষমা চাইলাম। যে আনন্দের কথা তিনি আমাকে বলে গিয়েছেন, তিনি নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছেন। তাঁর চেহারা, কথাবার্তা, আচার-আচরণই তার প্রমাণ। হয়তো, সর্বদাই সেই আনন্দে তাঁর প্রাণ ভরপুর হয়ে থাকত না। কখনো কখনো সেই আনন্দ তিনি অনুভব করতেন, আর তা ছিল, তাঁর জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু আমি

কদাপি সেই আনন্দের সন্ধান পাইনি। কী বা স্বরূপ, তাও অনুমান করতে পারি না। ওস্তাদজীর কাছে আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল।

ছিল, কিন্তু সে-আনন্দ বোধহয় গুলে খাওয়াবার মতো জানাবার বিষয় না। যেমন গান শেখা যায়। কিন্তু গান গাইতে জানা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। শেখে অনেকে। গাইতে পারে ক'জন? লেখাপড়া করে অনেকে। পণ্ডিত কজন হয়? মানুষের মতো দেখতে সবাই। মানুষ কজন? যেন সেই গানটার মতো, 'স্বদেশ স্বদেশ করিস তোরা, স্বদেশ তোদের কই?'...

না, ওস্তাদজীর কথিত সেই আনন্দের সন্ধান আমি পাইনি। তিনি আর যা সব বলেছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরেই আমার জীবনে ফলেছে। তবে তার মধ্যেও একটা বিরাট শূন্যতা আছে। আমি তাঁর মতো প্রসন্ন মেজাজ পাইনি। তিনি সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দিতেন, কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারতেন, গভীর ব্যথার মধ্যে ডুবে গিয়ে সকলের সব অপরাধকে ক্ষমা করতে পারতেন। আমি পারি না। ওস্তাদজী সে-শক্তিই বা কোথায় পেয়েছিলেন?

আমি তো হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারি না। চোখের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যে দেখেছে, সে-ই জানে, চোখের জলের স্রোত কী তীব্র হতে পারে। গ্লানিকে আবর্জনার মতো ভাসিয়ে দিতে পারে। আমি প্রসন্ন নই। আমি ক্ষমা করতেও পারি না। আমি অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, সর্বদাই যেন একটা জ্বালায় জ্বলছি।

না, সর্বদা বলাটা ঠিক না। একটা সময়েই আমি সমাহিত হতে পারি। আমার পরিবেশ, সমাজ, বেষ্টিত লোকজন, ভক্ত চাটুকার, কারোর কথা মনে থাকে না। সেটা একটিই মাত্র সময়, যখন আমি গান করি। এক ঘণ্টা, দু ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা, কখনো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রায় সারা রাত, গান করতে করতে আমি সব ভুলে যাই। ক্রোধ ক্ষোভ জ্বালা যন্ত্রণা, কিছুই তখন আমাকে স্পর্শ করে না। কিন্তু শেষ হবার মুহূর্তেই যখন সবাই সাধুবাদ দিয়ে ওঠে, করতালি দেয়, তখন আমার

ইচ্ছা করে, ওদের গলা টিপে দিই। হাত মুচড়ে, পাঞ্জা ভেঙে দিই। অথবা আমার মুখে ফুটে ওঠে, শুধুই ব্যঙ্গের হাসি।

কেন? একে আমার মনের বিকৃতি ছাড়া আর কী বলব? এত প্রীতি, এত উত্তপ্ত সংবর্ধনা, অভ্যর্থনা, উচ্ছ্বাস। তার জবাবে আমার এই মনোবৃত্তি কি বিকৃত না? অথচ মানুষ ছাড়া আছেই বা কী? মানুষ ছাড়া, আমার নিজের অস্তিত্বই বা কোথায়? না হলে তো সব সময়ে আমি গান নিয়েই থাকতে পারতাম। তা তো কই, পারি না?

পাশের দুই বার্থের কূপেতেই মনোরমা যাচ্ছে, সঙ্গে ওর মা। মনোরমা কথক নৃত্যের শিল্পী। ইদানীংকালে ভালই নাম করেছে। এখন রাত্রি প্রায বারোটা বেজে গিয়েছে। মনোরমা রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমার এখানেই ছিল। ওকে আমি চিনি অনেককাল আগে থাকতেই, যখন নৃত্যশিল্পী হিসাবে ওর মোটেই নাম হয়নি।

আমি নাচের বিষয়ে বুঝি খুবই কম। কিন্তু ভাল-মন্দ বোধ কিছুটা আছে। সেই বোধ থেকেই, আমি বুঝতে পারি, মনোরমা ওর নাচের মধ্যে, এখনো দেহটিকে অতিক্রম করে উঠতে পারেনি। কথাটা বোধ হয় কিছুটা অস্পষ্ট হল। দেহই নাচের সম্পদ, কিন্তু বিশেষ বিশেষ উচ্চাঙ্গের নাচ দেহকে আশ্রয় করেই, আমাদের নিয়ে যায় এক দেহাতীত অনির্বচনীয় অনুভূতির মধ্যে। মনোরমা এখনো সেটি আয়ত্ত করতে পারেনি, অথবা আয়ত্ত করা ওর দ্বারা সম্ভব না।

প্রথম দিকে ও আর দশটা সাধারণ নাচিয়ে মেয়ের মতোই, এখানে সেখানে তথাকথিত 'নৃত্য' করে বেড়াত। ওর শরীরের গঠনটি সুন্দর। চোখে-মুখে একটি চটক আছে। সেই সময় থেকে ওকে আমি চিনি। কোন একটা অনুষ্ঠানে, আমি গান করতে গিয়েছিলাম। মনোরমা এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে পরিচয় করেছিল। ওকে দেখে আমার ভালই লেগেছিল। আসরটি প্রধানতঃ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের

যথার্থ আসর ছিল না। ওস্তাদজী তখনো বেঁচে আছেন। তিনিই আমাকে পাঠিয়েছিলেন ঠুংরী গাইবার জন্য। মনোরমার নাচ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। আমি মনে মনে খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। নিতান্তই তথাকথিত ফিল্মি নাচ বলতে যা বোঝায়, সেইরকম লাস্যভরা যৌন আবেদনের তরঙ্গে উথলানো নাচ ও নেচেছিল।

আমি হলফ করে বলতে পারি, ওস্তাদজী যদি সেই আসরে থাকতেন, মনোরমার নাচ দেখে, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করতেন। কিন্তু ওস্তাদজী নিজে আমাকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। বিরক্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করার আমার উপায় ছিল না। মনোরমার যদি বুদ্ধি থাকত, বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর সঙ্গে, তারপরেও আর কথা বলতে আসত না, বা ওর নাচের মতামতের কথা জিজ্ঞেস করত না।

আমি লোকটা আদৌ মুনি-ঋষি না। নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের শিষ্য আমি। তাঁর হাতের মার, মুখের গালাগাল, ভালবাসা স্নেহ এবং সর্বোপরি গানের শিক্ষা পাওয়া ছাড়াও, আর একটি চরিত্রও পেয়েছিলাম। তরুণী, এবং বিশেষ করে সুন্দরী, এবং গুণী হলে তো কথাই নেই, তার প্রতি প্রীতি আসক্তি জন্মাতে সময় লাগত না। ওস্তাদজী খুব ভাল বাংলা বলতে পারতেন। প্রায়ই একটা কথা বলতেন তিনি তাঁর বিশেষ কয়েকজন প্রিয় শিষ্যকে, 'গায়কের দম ওম্‌ দুই-ই চাই। অকারণে বেশি দম কখনো নষ্ট করবি না। কিন্তু ওম্‌ না করলে, গলার স্বরে জাদু নামে না। তবে ওম্‌ করতে গিয়ে ফুটে যাস্‌ না।'

অনেকের কাছেই, এসব কথা দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। যেমন বাউলরা গান করে, 'ওরে আয়, কে প্রেমের গাঁজায় দম দিবি আয়।' তাদের কাছে ওই 'দম' শব্দটি আসলে প্রাণায়ামের রূপক। নিতান্ত গঞ্জিকা সেবন না। সেই জন্য এ গাঁজা, প্রেমের গাঁজা। কারণ 'দম দিবে যদি এ গাঁজাতে, শুদ্ধি হবে ত্রিবেণীতে।' বাউলদের গান মাত্রই রূপক আর প্রতীকে ভরা। ওস্তাদজীর দম আর ওম্‌ কথাটিও সেইরকমের, বিশেষ প্রতীকি। দম নষ্ট না করা, মানেই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত না হওয়া।

কিন্তু ওম্ করতে হলেও, নারীর দেহই একমাত্র আশ্রয়।

নারীর ভাবনা পরে। বলছিলাম, আমি মুনি-ঋষি না। অতএব মনোরমাকে—তখন মনোরমার বয়স ষোল-সতেরোর বেশি না, আমি না বলে পারিনি, 'এসব নাচ তো সস্তা সিনেমার পর্দায় দেখা যায়। এখানে কেন?'

একটা ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে, আমার মন্তব্যে খুবই আহত হয়েছিল। সত্যি, ওর দোষ কী? উদ্যোক্তরা জেনে-শুনেই ওকে ডেকে এনেছিল। যথেষ্ট হাততালিও জুটেছিল। এমন কি, এন্‌কোর এন্‌কোর চিৎকারও শোনা গিয়েছিল যে-কারণে উদ্যোক্তাদের একজন মাইকের সামনে গিয়ে বলেছিল, 'মনোরমা ঘোষ পরে আপনাদের সামনে আবার আসবেন। এখন প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমাদের অনুষ্ঠান চলবে।'

এর নামই বোধ হয় জনতা। ইংরেজিতে এরা পিপল, না মাস্? যাই হোক, আমি মনোরমাকে হেসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, 'আমি তোমার নিন্দে করিনি। যে-কোন ভাল ফিল্মের নর্তকীর থেকে তুমি ভাল নাচতে পার। ফিল্মে সুযোগ নাও না কেন?'

মনোরমাকে আমি সান্ত্বনা দিতে চাইলেও, আমার মনোগত কথাটি ও যথার্থই বুঝতে পেরেছিল। কারণ মেয়েটি বোকা না। ঠিক সেই সময়েই আমি বুঝতে পারিনি, মনোরমা খুবই অ্যামবিশাস মেয়ে। ইংরেজিতে অ্যামবিশাস কথাটার অর্থ অনেক সময়েই একটু ভিন্ন অর্থে ধরা হয়। কিছুটা মালিন্য, কিছুটা বা হীনতাও যেন থাকে। অথচ মানুষ মাত্রেরই উচ্চাভিলাষী না হবার কোন কারণ নেই। উচ্চাভিলাষ অন্যায় কিছু না।

মনোরমাকে আমি সেই হিসাবেই অ্যামবিশাস বলেছি। আমার সান্ত্বনার জবাবে, মুখটা একটু করুণ করে বলেছিল, 'আমার কোন সুযোগ নেই। ভাল নাচ শেখবার রাস্তাও দেখি না।'

আমি মনে মনে বিরক্ত হলেও, কৌতূহলিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কী ভেবে তুমি এ পথে এলে?'

আসলে আমার মনের কথাটা ছিল, মনোরমাকে এই বিশ্বসংসারে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে যে, ওকে নাচতেই হবে? হয়তো লেখাপড়ার দিকে মন ছিল না, বাড়ির পরিবেশ সে-রকম ছিল না, ঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য। অতএব, নাচতেই চল। অনেক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারেই এই ছবিটা খুব দেখা যায়। গান নাচ অভিনয়, যা হোক, একটা কিছুর চর্চা, যেন না করলেই নয়। তার সঠিক মনোভাব কী, কোন পথে গেলে সে নিজের আত্মপ্রকাশের পথকে সুগম করতে পারত, সে-সব ভাববার কোন অবকাশই নেই। যার ফলে, ছেলে-মেয়েদের মনে কতকগুলো মিথ্যা ধারণা আর বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, আর সেই ধারণা এবং বিশ্বাস থেকে, শিল্পের পথে নিজের প্রতিভার একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে থাকে, যা ব্যর্থ হতে বাধ্য। এরকম ব্যর্থতা আমি অনেক দেখেছি।

অবিশ্যি, অশিক্ষিত ব্যর্থ শিল্পীকে নিয়ে পত্র-পত্রিকায় ঢাক-ঢোল বাজাতেও কম দেখি না। তার পশ্চাদ্‌পট কী, তাও সকলেই অনুমান করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে, বৃহৎ পত্রিকার মতলববাজ ব্যক্তিরা, প্রতিভাশূন্য মেয়েদের হয়ে অনেক সময় ঢাক বাজায়। তা ছাড়া, টাকার ব্যাপারও থাকে কোন কোন ক্ষেত্রে। এসব দিয়ে বেশিদিন হয়তো চলে না। যত দিন চালানো যায়।

মনোরমা আমাকে জবাব দিয়েছিল, 'ছেলেবেলা থেকেই আমার নাচের দিকে খুব ঝোঁক।'

অনেকেরই অনেক দিকে ঝোঁক থাকে, কিন্তু সেই ঝোঁকের মধ্যে কতখানি খাঁটিত্ব থাকে, ত্যাগ এবং আত্মসমর্পণ থাকে বলে, ভবিষ্যৎটা নির্ভর করে তার ওপর। মূঢ়দেরও অনেক ঝোঁক থাকে। ঝোঁক থাকে তাদেরও, যাদের প্রকৃত শিল্প মানসিকতা আছে। কিন্তু তারা হয়তো সারাটা জীবন কেবল সংগ্রাম করে যায়, আত্মপ্রকাশের সুযোগ কোনদিনই আসে না।

মনোরমার কথা থেকে বুঝেছিলাম, ওদের বাড়ির পরিবেশ তেমন

সুবিধার ছিল না, কিন্তু নৃত্যশিল্পী হবার বাসনাটা ওর মনে নানাভাবেই রোপিত হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই ওর স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের দিকটা চোখে পড়বার মত ছিল। ইস্কুলের দিদিমণিদের কাছে নাচের হাতে-খড়ি। তারপরে এর তার কাছে। আর তা করতে গিয়েই, নাচের জন্য আজ এখানে, কাল সেখানে, বিভিন্ন পাড়া আর ক্লাবের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছে। কিছু প্রশংসাপত্র, সার্টিফিকেট, জীবনের ক্ষেত্রে যে-গুলোর কোন মূল্যই নেই, তাও অনেক জুটেছে। কিছু কাকা-দাদারা জুটেছিল, যারা ওকে নিয়ে মাতামাতি করে তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল, যার পরিণতি ওকে সঠিক পথে চালিত করেনি।

আমি জানি, আমাদের দেশে, ছেলেদের তুলনায় একটি মেয়ের পক্ষে মাথা তুলে দাঁড়ানো কত কঠিন, কত বাধা-বিঘ্ন। মনোরমাকে আমার উপদেশ দেবার কিছু ছিল না। নিজের জীবন-বৃত্তান্ত ফেঁদে বসারও কোন কারণ দেখিনি। মনোরমার মতো, কিছু লাস্যভরা নৃত্যশিল্পী, তখনো গণ্ডায় গণ্ডায় ছিল। এখনো সেরকম পশ্চাদ্দেশ নাচিয়ে প্যালা কুড়োবার নৃত্যশিল্পী কিছু কম নেই। আমি ওকে বলেছিলাম, 'তোমার ভেতরে যে-রকম ইচ্ছা, তুমি একজন ভাল গুরু পেলে, আমি খুশি হব। আর যদি কিছু মনে না কর, তো বলি, উৎসর্গ ছাড়া কিছু হয় না। মনে-প্রাণে উৎসর্গ করার দরকার আছে, আর সেটা সারা জীবনের জন্য।'

মনোরমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে এই রকম আলাপ হয়েছিল। ও আমাকে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, গুরু সন্ধানের ব্যাপারে আমি ওকে কোনরকম সাহায্য করতে পারি কী না। বলা বাহুল্য, আমি ওকে সে-রকম কোন কথাই দিতে পারিনি। আমার নিজের ক্ষমতা আর খ্যাতির সম্পর্কে সচেতন ছিলাম। আমি তখন সবেমাত্র প্রতিশ্রুতিবান হিসাবে পরিচিত হচ্ছিলাম। আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, সেই সময়ে অনেকে আশা পোষণ করছিলেন। অতএব, আমার এমন ক্ষুদ্র পরিচয়ে, কোন বড় নৃত্যশিল্পীর কাছে মনোরমাকে নিয়ে যাব, বা পাঠাব, সে

ক্ষমতা আমার ছিল না।

পরে আমি শুনেছিলাম, মনোরমা, মিস্ মনোরমা হয়ে, ক্যাবারে নাচের দিকে ঝুঁকেছে। মনে মনে ভেবেছিলাম, যাক, শব শেষ পর্যন্ত শ্মশানেই যায়। মনোরমাও তার যথার্থ স্থানে গিয়েছে। এক্ষেত্রে শ্মশান না বলে অবিশ্যি ভাগাড়ই বলা চলে। কারণ আমাদের দেশে, ক্যাবারে নিয়ে যত মধুর কথাই বলা হোক, তার ব্যাকগ্রাউণ্ড কী, অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানে।

কিন্তু কিছুকাল পরে, খবরের কাগজে, কত্থক নৃত্যশিল্পী হিসাবে মনোরমার সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন দেখে, অবাক না হয়ে পারিনি। বিখ্যাত তাবিল মিয়াঁর তবলা-বাদনের সঙ্গে, মনোরমার একক কত্থক নৃত্য পরিবেশনের বিজ্ঞাপন আমাকে চমকিয়েই দিয়েছিল। তাবিল মিয়াঁ লোকটিকে আমি কখনো খুব ভাল মনে করতাম না। সে ভাল তবলচি, কোন সন্দেহ নেই। লহরাতেও তার যথেষ্ট নাম-ডাক ছিল। কিন্তু কথায় বলে, সবই ভাল, কোথায় যেন একটু আঁশটে গন্ধ রয়ে গিয়েছে। তাবিল মিয়াঁ সেই জাতের লোক।

আগেই কবুল করেছি, মেয়েদের বিষয়ে আমি আদৌ মুনি-ঋষি মনোভাবের লোক না। যদিও, মুনিরও নাকি মতিভ্রম হয়। আমার যথেষ্ট ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা তৃষ্ণা আছে। কিন্তু তাবিলের মত লোলুপতা নেই। যে-কোন মেয়েই হোক, সে যদি সহজলভ্য হয়, তাবিল যেন-তেন প্রকারেণ তার ইচ্ছাপূরণ করবে।

আমার বাসনা আছে, লোলুপতা নেই। দারিদ্র্য এক কথা, দারিদ্র্যের হীনতা আর এক কথা। হীনতার আশ্রয় নিতে আমি বরাবরই হীনতা বোধ করেছি। আর হীনতার জন্ম সম্ভবতঃ, পরাজয়ের মনোভাব থেকে। অক্ষমতার হতাশা থেকে। ইংরেজিতে যাকে রোগ এলিফ্যাণ্ট বলে। প্রেমের দ্বন্দ্বযুদ্ধে যারা পরাজিত আর হতাশ হয়ে, দলত্যাগ করে। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে, কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে অংশ নিতে হয়নি, হতাশও হতে হয়নি। অতএব উক্ত শ্রেণীর হীনতা আমাকে

কখনো স্পর্শ করতে পারেনি।

কিন্তু হতাশা কি আমার মধ্যে নেই? হয়তো একটু বেশিই আছে। বাঙালীদের মধ্যে গানের বাণীর ক্ষেত্রে, এখনো রবীন্দ্রনাথকে কেউ অতিক্রম করতে পেরেছে বলে, আমি মনে করি না। যদিও রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে আমি, যাকে বলে ক্রিটিক্যাল, তা-ই। তবে তার মধ্যে অসম্মাননার কিছু নেই। যে-কারণে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর কথা বললাম, তা হল, আমার অবস্থার ব্যাখ্যার জন্য। আমার অবস্থা, 'প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।' এই কান্নাটাই রূপান্তরিত হয়ে, আমার মধ্যে সৃষ্টি করেছে অসুখ।

অবিশ্যি এটা বিশ্বরূপ চক্রবর্তীর বর্তমান মানসিক অবস্থা। যাই হোক, মনোরমার নামের সঙ্গে তাবিল মিয়াঁর নামটা দেখে, আমি অস্বস্তি বোধ করেছিলাম। বিজ্ঞাপনে কোথাও, মনোরমার নাচের গুরুর কোন উল্লেখ ছিল না। আমিও আর তেমন উৎসাহ বোধ করিনি। মনে করেছিলাম ক্যাবারের ভাগাড়ের থেকে, এটা মন্দের ভাল।

কিন্তু মনোরমা তারপরেও আমাকে অবাক করেছিল। প্রায়ই ওর একক নৃত্যের বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত। তারপরেই একটি নামী দৈনিকে ওর বিষয়ে একটি প্রশংসাসূচক লেখা বেরোল, যার মধ্যে ওকে একজন বিশেষ প্রতিশ্রুতিময়ী কথক নৃত্যশিল্পী বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। আমি হয়তো প্রবন্ধটিকে খবরের কাগজের সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পের সমালোচকের তথাকথিত ভেলকি বলেই মনে করতাম। কিন্তু সেই প্রবন্ধেই প্রথম মনোরমার কথক-নৃত্যের গুরুর নামটা ঘোষিত হয়েছিল। সেই নামটিই আমাকে বিস্মিত ও চমকিত করেছিল। সেই বয়স্ক নৃত্য-বিশারদ গুরুর সান্নিধ্য স্নেহ আমিও পেয়েছিলাম। তিনি আমার গান শুনতে ভালবাসতেন।

তিনি মনোরমার গুরু, একথা কাগজে পড়বার পরে, তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, আমি মনোরমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি ঠিক এই উক্তি করেছিলেন, 'যদি মনোরমা ঠিক থাকে,

চালিয়ে যেতে পারবে। একেবারে শেষ অবস্থায় ও আমার হাতে এসেছে। দুধ খাঁটি হলে কী হবে, মাঠা তুলে নিলে, তার অনেকখানিই চলে যায়। মনোরমারও গেছে। তবে এখনো যা আছে, রক্ষা করতে পারলে, চালিয়ে যেতে পারবে।'

তারপরেই এক সারারাত্রি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সেটা খুব বেশিকাল আগের কথা না। নাসিরুদ্দিনের শিষ্য হিসাবে, আমার খ্যাতি তখন উজ্জ্বলতর। বিশ্বরূপ চক্রবর্তী তখন প্রতিশ্রুতিবানের থেকে প্রমোশন পেয়ে প্রতিষ্ঠিতের পর্যায়ে উঠেছে। মনোরমা এসে আমাকে প্রণাম করে বলেছিল, আমার কথা মনে রেখেই, ও গুরুর সন্ধান পেয়েছে, নিজেকে উৎসর্গ করার পথও চিনে নিয়েছে।

মনোরমাকে সেই সময় দেখে মুগ্ধই হয়েছিলাম। ষোল-সতেরো বছরের মেয়েটি তখন বছর চব্বিশ-পঁচিশের কম নয়। প্রায় আট বছর পরের কথা। ওর চেহারা, চোখ-মুখের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছিল। আমার মুগ্ধতাকে অনুভব করতে ওর বেশি সময় লাগেনি। তারপর থেকে, ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার যোগাযোগ হত।

সত্যি কথাটা তাহলে স্বীকার করাই যাক। মনোরমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যে-সম্পর্ক নারী-পুরুষের মধ্যে কোন বিধি-নিষেধের বাধাই রাখে না। ব্যাপারটা ছিল সাময়িক, সরে আসতেও দেরি হয়নি। কিন্তু তা নিয়ে দুজনের মধ্যে কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয়নি। আমি একটা মুক্তির স্বাদ ও স্বস্তি পেয়েছিলাম। মনোরমা কিছুটা বিমর্ষ ছিল, কিছুকাল। কাটিয়ে উঠতে দেরি হয়নি।

আজ এই রাত্রের ট্রেনে, আমি যেখানে গান করতে চলেছি, মনোরমা সেখানেই নাচতে যাচ্ছে। এখন মনোরমা একলা কোথাও যাতায়াত করে না। যেখানেই যায়, ওর মাকে সঙ্গে নিয়ে যায়। এর দরকারও আছে। মেয়েদের একটা আশ্রয়ের দরকার আছে। সেটা তার নিজের জন্য যতখানি দরকার, তার চেয়ে বেশি দরকার তথাকথিত ভক্ত বা পিপলস্ বা মাস্, যাই বলা যাক, তাদের জন্য। এদের চোখের সামনে,

একজন কেউ অভিভাবকের চেহারা নিয়ে থাকলে, মেয়ে শিল্পীরা অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করে।

আমার সঠিক জানা ছিল না, মনোরমা এই ট্রেনে, একই প্রথম শ্রেণীর বগীতে যাচ্ছে। ও নিজে থেকেই আমার কুপেতে এসেছিল। আমি তখন পানপাত্র নিয়ে বসেছিলাম। এ ব্যাপারটার জন্য আমি পরের মুখাপেক্ষী থাকি না। পথের প্রয়োজনে যা লাগে, তার চেয়ে বেশিই বহন করি। বলা যায় না, কখন কী পরিস্থিতিতে পড়তে হতে পারে। একেবারে বেহেড মাতাল কখনোই হতে পারি না। দু বোতল হুইস্কি ছাড়াও, একটি ভারমুথ সঙ্গে নিয়েছিলাম। এটা নিজস্ব মুডের ব্যাপার। কখন কী হবে, সেইজন্যই সঙ্গে রাখি।

মনোরমাকে ভারমুথ অফার করেছিলাম। প্রথমে কিঞ্চিৎ আপত্তি করলেও, পরে কিছুটা ভারমুথ পান করেছে। আমার কুপেতে যারা আছে, তাদের কাছে ঘটনাটা বিশেষ কৌতূহলের ছিল। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে, তারা সবাই বাইরের করিডরে চলে গিয়েছিল। আমাদের নিরিবিলিতে থাকতে দিয়েছিল। দরজাটাও ওরা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। আমি বারণ করেছি। ওরা যে-রকম প্রত্যাশা করেছিল, ঘটনাটা আদৌ সে রকম না। মনে মনে ওদের ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। যদিও টের পাচ্ছিলাম, নিতান্ত আড়াল থেকে ওদের কৌতূহল নিবৃত্ত হচ্ছিল না। মাঝে মাঝেই করিডরের এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে যাবার সময়ে আড়চোখে আমাদের দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন কারণ ছিল না। ঘটনা সামান্য, হয়তো পত্রপল্লবে অসামান্য হয়ে উঠবে। কিছু করার নেই।

গত শীতের পরে, আবার এই প্রাক্-বসন্তে, শেষ-শীতে মনোরমার সঙ্গে দেখা হল। চেহারা দেখে এমনি কিছু বোঝবার উপায় ছিল না। স্বাস্থ্য ওর বরাবরই ভাল। বিশেষ করে, শরীরের গঠনটি সুন্দর, এবং এখনো বিন্দুমাত্র মেদ জমতে দেয়নি। কিন্তু চোখের কোলে কিঞ্চিৎ কালির আভাস ছিল, চোখে একটা অসুখী বিষণ্ণতা, গোটা মুখে একটি

ক্লান্তির ছাপ।

কথাবার্তার মধ্যে, পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা, ট্রেনে সাক্ষাতের বিস্ময়, কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রকাশ, এবং আমাদের গন্তব্যের স্থানটি বিষয়ে কিছু আলোচনা। স্থানটি সম্পর্কে আমার একটি দুর্বলতা ছিল। যে-শহরে আমরা যাচ্ছি, তার কিছু দূরের এক পল্লীতেই আমার গুরু, ওস্তাদজী নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের জন্মস্থান। মৃত ওস্তাদজীর সেই জন্মস্থান পল্লীটি একবার দেখে আসার খুব ইচ্ছা। অন্যথায় হয়তো, এই অনুষ্ঠানে গাইতে যেতাম না।

মনোরমা নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রথমে বলতে চায়নি। পরে যা বলে গেল, তা হল, জীবনের অর্থহীনতা। অর্থহীনতার বিষ অনেক শিল্পীর মনেই মাঝে-মধ্যে দংশন করে। কিন্তু মনোরমার একটি কথা খুবই দুর্ভাগ্যজনক মনে হল। ও ভাবতে পারে না, গোটা জীবনটা কেবল নেচেই কাটাতে হবে। এটাই যদি ওর জীবনের ক্লান্তি হয়, তা হলে আর মনোরমা ঘোষের মৃত্যুর বাকি কী থাকে?

আমি অবিশ্যি এরকম কিছু বলিনি, ঠাট্টার সুরে বলেছি, 'কী চাও? সমাজসেবা করার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?'

মনোরমার জবাব, 'কী যে করতে ইচ্ছে করে, তা বুঝি না। কিন্তু সারা জীবন নেচে কাটাতে হবে, এটা ভাবতে পারি না।'

আর আমি ভাবতে পারি না, গান ছাড়া আর কী নিয়ে আমি বাঁচতে পারি?

মনোরমাকে নিয়ে ভাবতে বসার কিছু নেই আমার। ও চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। রাত্রিও অনেক হল। আমার সঙ্গীরা সকলেই আড়াল করে যথেষ্ট মদ্যপান করেছে। খাবার খেয়েছে, এবং শুয়েও পড়েছে। নিচে আমার আসনের মাথার কাছে, আয়নার নিচে টেবিলের ওপরে আমার খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে, খাইনি, খাবও না। আমার পানীয়র পাত্র এখনো শূন্য হয়নি। একটি নীল আলো ছাড়া

সব আলোই নিভিয়ে দিয়েছি। একটা কম্বল গায়ের ওপর টেনে নিয়ে কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে দেখছি।

বাইরে চাঁদের আলো। চোখের ওপর দিয়ে যেন একটা রহস্যময় জগৎ দ্রুত অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন জগৎ ভেসে উঠছে। কখনো আবছা দিগন্তবিসারি মাঠ। কখনো গাছপালা নিবিড় বন। কখনো চাঁদের আলোয় চিক চিক করে উঠছে নানা আকারের জলাশয়। পুকুর, ডোবা, কোন স্রোতস্বিনী নদীর রেখা। মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে দিয়ে, হঠাৎ কোথাও একটি কি দুটি আলোর বিন্দু ঝটিতি ভেসে উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কোন গ্রামীণ মানুষ এত রাত্রে আলো হাতে কোথাও চলেছে। কিংবা, কল্পনা করা যেতে পারে, কোন গৃহস্থ রমণী, আলো হাতে বাড়ির উঠোনের এপার থেকে ওপারের ঘরে যাচ্ছে।

আর নতুন করে মদ গেলাসে ঢালবার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। একটা বার্মা সিগার ধরিয়েছি। সিগারে টান দেবার সময়, বন্ধ কাঁচের জানলায় অঙ্গারের বৃহৎ বিন্দু প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, আর তারই আলোয়, প্রায় অঙ্গারের মতই আমার চোখ দুটোও ভেসে উঠছে। সব মিলিয়ে, সিগারের অঙ্গার, আমার চোখ, বাইরের জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতি, আমার প্রাণের দু-কূল ভরিয়ে কেমন একটা আবেগের সৃষ্টি করছে। যে আবেগ থেকে উৎসারিত হয়ে উঠতে চাইছে কেবল সুর।

এই কুপে-র মধ্যে আমি একলা থাকলে নিশ্চয়ই এখন গলা খুলে সুর ভাঁজতাম, কিন্তু এখন নিচু স্বরে গুন গুন করতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। আহ্, এই সময়টা যদি আমি একলা হতে পারতাম! একাকীত্ব বোধ সর্বদাই আমার কোথায় যেন বেহালার তারের ঝংকারের মত বাজে। আপাতত গানের সুর করার পক্ষে, এই লোক তিনটির অস্তিত্ব আমাকে আড়ষ্ট করে দিচ্ছে। কিন্তু সুর বাজছে। আমার ভিতরে ঝর্ণাধারার মত কলকলিয়ে গুনগুনিয়ে, নিঃশব্দে তা বেজে চলেছে। আর আজকাল, যা আমি কিছুতেই চাপতে পারি না, তা হল চোখের জল। বিশেষতঃ এমনি একটি মুহূর্তে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে, জ্যোৎস্নালোকে আমার চোখে একটা স্বপ্ন নেমে আসছে। কে যেন এই রহস্যময় প্রকৃতির ভিতর দিয়ে, আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাওয়ার কোন শব্দ নেই, কেবল বাতাসে ধুলো আর শুকনো পাতা তার পায়ে পায়ে উড়ে চলেছে। আর সুর আমার বুকের মধ্যে হাহাকার করছে। একে আমি কল্পনায় অনেকবার দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি, গানের ঘোরের মধ্যে দেখেছি, কিন্তু কখনো চিনতে পারিনি। কারণ, সে সব সময়েই আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকে। মনে হয়, আমি যেন সারা জীবন ধরেই তাকে দেখবার জন্য, ডেকে আকুল হচ্ছি। অথচ সে কখনো মুখ ফিরিয়ে তাকায় না।

জীবনের প্রতি এক আশ্চর্য ক্ষোভ বিতৃষ্ণা বোধের মধ্যেও, একমাত্র গানের মধ্যেই আমি একটা প্রশান্তির গভীরে ডুবে যেতে পারি। যে কারণে মনোরমার নাচে ক্লান্তির কথা শুনে, আমার একটিমাত্র কথাই মনে জেগে উঠেছিল, গান ছাড়া আর কী নিয়ে আমি বাঁচতে পারি! আমার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখা সেই মুখ, অথবা নিজেকেই যদি খুঁজে ফিরি, তা আমি পারি একমাত্র সঙ্গীতের মাধ্যমেই। এখন আমার কাছে জীবন বলতে যা বোঝায়, তার উলটো পিঠের নাম সঙ্গীত।

কিন্তু সম্প্রতিকালে প্রায়ই আমার মনে হয়, যে-গান নিয়ে আমার প্রশান্তি, তার মধ্যে কোথায় যেন একটি অপূর্ণতা থেকে যাচ্ছে। যে-গানের জন্য, জীবনের কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করিনি, কোন লাঞ্ছনা অপমানই আমাকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি, আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়, আমি সেই সঙ্গীতের প্রকৃত স্বরূপকেই যেন চিনতে পারিনি। ওস্তাদজী বেঁচে থাকলে, আজ তাঁর পায়ে মাথা কুটে মরতাম, বলতাম, 'গুরু! আমি চাবুক হাতে বাঘের খাঁচার মধ্যে ঢুকে, কেবল দুর্দান্ত হিংস্র বাঘদের নিয়ে খেলা দেখাতে চাইনি। গানের সেই কালোয়াতি বিদ্যা তোমার কাছ থেকে আমি অধিগত করেছি। কিন্তু কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা বাজছে, আমি তার মর্মের পরিচয় আয়ত্ত করতে পারছি না।

সুরের স্বরূপকে আমি চিনতে পারছি না। আমাকে সেই অনুভূতি দাও। আমি যেন অনেক দূরের পথ পেরিয়ে এসে, এক কঠিন দুর্ভেদ্য বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। মাথা ঠুকছি, সেই দরজা খুলতে পারছি না। গুরু, আমাকে শক্তি দাও। আমাকে পূর্ণ করো।'…

ওস্তাদজীর দুটি কথা আমি কখনো ভুলিনি। একটি হচ্ছে, 'আনন্দ'। এই আনন্দের স্বরূপটি এখনো আমার অগোচরে রয়েছে। মাঝে মাঝে ভাবি, এই আনন্দের অনুভূতিই কি পূর্ণতা? তবে, কেমন করে সেই আনন্দকে আমি আয়ত্ত করব? ওস্তাদজীর কথা থেকে বুঝেছিলাম, সব কিছু হাতে-কলমে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেওয়া যায় না। সব কিছু কানে মন্ত্র গুঁজে পাইয়ে দেওয়া যায় না। আপন তপস্যার দ্বারা তা পেতে হয়। কিন্তু আমি যে সেই তপস্যা জানি না! তাই এখন মনে হয়, একেবারে পুরনো, সেই কৈশোরের অতীতে কি ফিরে যাওয়া যায় না? ওস্তাদজীর কাছে সেই কঠিন চর্যার দিনগুলোকে আর ফিরে পাওয়া যায় না?

মনে আছে, একটা সুরের গৎ-এ যদি বারে বারে ভুল করতাম, তাহলে ওস্তাদজী বারে বারে তা দেখিয়ে দিতেন। তারপরে যখন সেটা প্রাথমিক আয়ত্তে আসত, ভাবতাম, এবার মুক্তি। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতাম। কিন্তু ওস্তাদজী বাইরে থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলতেন, 'হাজার দফে ওটা রেওয়াজ করে যা, তারপরে দেখব, কতটা ধরতে পেরেছিস।'

হাজার দফে না, হাজার হাজার দফে! ক্ষুধা-তৃষ্ণা? ভুলে যা। কষ্ট হচ্ছে? অচৈতন্য হয়ে পড়বি? তাই পড়্, কিছু যায়-আসে না। তখন মনে হত, বড় কষ্ট, আর সইতে পারছি না। সইতে পারছ না তো, বেরিয়ে যাও। ওস্তাদজীর কাছে ও মুখ আর দেখাতে এস না।

না, ওটা কখনো পারিনি। এমন কিছু করিনি, তাঁকে এ মুখ আর দেখাতে পারব না। হায়, তারপরেও তানপুরার তারে আঙুল বুলিয়ে, সুরে ভুল হল। আবার তালিম। আবার দরজা-বন্ধ ঘরে

শিক্ষা। এক-আধটা চড়-চাপড়? কোন ব্যাপারই না। চুল টেনে ছিঁড়েও দিতেন, আর বিদ্রূপ করে বলতেন, 'বাজারি তয়ফাওয়ালীর বাড়িতে গিয়ে হারমোনিয়ম বাজা, রইস আদমিদের কাছ থেকে দু-চার টাকা প্যালা পাবি, আর সেলাম ঠুকে বাড়ি যাবি। আর নয়তো যদি বেশ্যাবাড়ির গায়ক হতে চাস, তো আর দরকার নেই, ঢের হয়েছে।'

লজ্জায় অপমানে চোখে জল আসত। কিন্তু অনেক কষ্টের পর যখন, সুচারুরূপে বারে বারে পরীক্ষায় পাস করতাম, ওস্তাদজীকে সুখী করতে পারতাম, তখন ভালবাসা আদরের কী পরিমাণ। না, তার কোন পরিমাপ ছিল না। আনন্দে আর সুখে, চোখ ভেসে যেত জলে। ওস্তাদজীর চোখও জলে ভেসে যেত। বারে বারে আদর করতেন, আর বারে বারেই বলতেন, 'ধর তো বেটা, আর একবার ধর। আবার শুনি।'

ওস্তাদজীর সে কি উচ্ছ্বাস! আমার সার্থকতায়, তাঁর খুশি যেন ছেলেমানুষের মত উল্লাসে ভরে উঠত, বলতেন, 'বাহ্! বাহ্‌রে বেটা, বাহ্! এই না হলে নাসিরার ছেলে!'

নাসিরার ছেলে! এই কথাটি শুনলে আমার বুকে যেন সুখের ঢেউ লাগত। জীবনে এর থেকে পরম সৌভাগ্য আর কী থাকতে পারে? নিজের সম্পর্কে তিনি কিছু বললে, নিজেকে 'নাসিরা' বলতেন। আর নিজের গুরুর গল্প করে বলতেন, 'আমার গুরুর নাম ছিল অল্‌খিয়া প্রকাশ। নিজেকে বলতেন, অলখাকে বেটা নাসিরা।'

অল্‌খিয়া প্রকাশ, প্রকৃতপক্ষে একজন সাধক সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁর ধর্মে হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ ছিল না। অলখ্ শব্দের মধ্যেই তাঁর ঈশ্বর সাধনার স্বরূপ। সেইজন্য তাঁকে সবাই অল্‌খিয়া প্রকাশ বলত: যদিও জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন হিন্দু। কিন্তু তথাকথিত হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান, কিছুই মেনে চলতেন না। তবে তিনি আদৌ ভোগবাদী ছিলেন না। বরং ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করেছিলেন।

যাই হোক, আজকাল আমার মনে হয়, যে-অপূর্ণতায় আমি অন্তরে

আর্ত, সেই অতীতে ফিরে যেতে পারলে, হয়তো আমি পূর্ণতাকে আবিষ্কার করতে পারতাম। সুর আর সঙ্গীতের যে-অপূর্ণতা বোধ আমাকে প্রতি মুহূর্তেই আর্ত আর সংশয়ান্বিত করে তুলছে, সেই অতীতের মত কঠিন চর্চাই হয়তো আমাকে পূর্ণতার স্বরূপকে চিনিয়ে দিতে পারে। কিন্তু কোথায় আমি সেই গুরু পাব? কোথায় আমার ওস্তাদজীকে ফিরে পাব? যিনি আমাকে বন্ধ ঘরে আটকিয়ে রাখবেন, আমার ভিতরের দুর্বলতাকে কঠিন আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করবেন।

ওস্তাদজী আর একটা কথা বলতেন, 'গানের থেকে জীবন বড়! গানের জন্য জীবন নয়, জীবনের জন্য গান। গানের মধ্য দিয়ে নিজেকে জানা, আর নিজেকে সুন্দর করার জন্যই গান। গানের মধ্যেই ধরা পড়বে জীবনের ফাঁকগুলো, আর তাকে ভরাট করে তোলার জন্যই গান। অবিশ্যি গানকেই যে জীবনের চর্চা হিসাবে নিয়েছে। তা হলে তোর গানটা কী দাঁড়াল? লোকের সামনে বসে, রূপ দেখিয়ে কালোয়াতি করার জন্য? ওটা মুর্দার কাজ। চোরের মন থাকে বোঁচকার দিকে। বোঁচকাই তার সব। আমি খুব ওস্তাদী করব, অথচ জীবনটাকে বাদ দিয়ে, ওটা কোন ওস্তাদীই না।'

এই কথার সঙ্গেই, অবাঙালী নাসিরুদ্দিন আহ্মেদ বলতেন, 'রবিবাবুর একটা বয়েৎ (কবিতা) আছে না, "মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে?" কেন বলেছেন? মরতে তো আমাদের সবাইকেই হবে। তবু কেন এই কথা, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে? ওইটাই হল জীবন। জীবনের তৃষ্ণা, আর ওই তৃষ্ণা থেকেই গানের জন্ম। সার হল জীবন, আর তার ওপরেই ফুল আর ফলের মত হল গান। জীবন মানেই সে কিছু জন্ম দেয়। মরদ অওরতের বাচ্চা জন্ম দেবার কথা বলছি না। জীবনের সৃষ্টি। সেই জন্য জীবনই সব থেকে বড়, আর জীবনের জন্যই গান।'

এই চল্লিশোর্ধ্বের জীবনে, এখনো মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি, ওস্তাদজী অনায়াসে কথাগুলো বলতেন কেমন করে? তাঁকে তো

দেখতাম, সব সময়ে গান নিয়েই আছেন। এসব কথা ভাববার অবকাশ কখন পেতেন? নাকি, ভাবতে হত না? জীবন সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল এমনই অনায়াস।

সুখ নেই, জ্বালা ছাড়া কিছু নেই, দুঃখই বড়, কিন্তু তার মধ্যেই আনন্দকে সন্ধান করে নিতে হবে। এই ছিল তাঁর কথা। তাঁর সে-সব কথাই আমার জীবনে মিলেছে। মেলেনি কেবল আনন্দ। এ আনন্দের অনুভূতি নিশ্চয়ই শিশ্নোদরপরায়ণ মানুষের সুখের আনন্দ না। তাহলে তো কবেই আমি দু হাত তুলে নৃত্য করতে পারতাম। কিন্তু এ আনন্দ সহজ হয়েও সহজ না। অতি অসহজের মধ্যেই এই সহজ আনন্দের অনুভুতি আসে। এ আনন্দ সাধারণ ধন। কী করে পেতে পারি? আমি যে সাধনা জানি না।

এই যে গানের স্বরূপ সম্পর্কে আমার বিচলিত-অনুসন্ধান, মনে হয়, তার বীজ রয়েছে এই আনন্দানুভূতির মধ্যে। আনন্দ আর গানের থেকে জীবন বড়। এই দুটি বোধের মধ্যেই বোধহয় আমার আত্মার গ্লানির মুক্তি রয়েছে।

আত্মার গ্লানি? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আত্মার গ্লানি। আমার অসুখ, অসন্তুষ্টি, ক্রোধ, ক্ষোভ, বিদ্রূপপরায়ণতার মধ্যে, আত্মার গ্লানি ছাড়া আর কী আছে? আমি বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, অথচ একতারা বাজিয়ে ফেরে, আলখাল্লা পরা, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লোকটার হাসিতে যে অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতা দেখতে পাই, সেই হাসি তো আমি হাসতে পারি না! আমার ঈর্ষার পাত্র তো এই জনম ভিখারীটা। অবিশ্যি যদি ও সত্যি ভিখারী হয়। আমার ধারণা, এটা ওর ছদ্মবেশ।

যে-লোকটা বিশাল হর্ম্যতলে বাস করে, ঐশ্বর্যের মোড়কে ঢাকা থাকে, পথে বেরোয় রাজার মত রাজসিক লিমোসিন-এ, তার প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নেই। আমি তা হতে চাই নি, অতএব তাকে নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই। সে যে-কারণে টাকা উড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সেই তামসিকতার শিকার তো আমিও, অন্য ভাবে। কিন্তু আত্মার

গ্লানি থেকে মুক্তি ?

অন্ধকারের আলো কথাটা আমার প্রায়ই মনে হয়। স্বয়ং ওস্তাদ-জীর জীবনের একটা ঘটনা আমাকে প্রায়ই কেমন উন্মুখ ও কৌতূহলা-ক্রান্ত করে তোলে। ঘটনাটির কোন সদর্থক ব্যাখ্যা আমি কখনো পাই-নি। ওস্তাদজী দুটি বিবাহ করেছিলেন। তিনটি কন্যাসন্তান, ছেলে একটিও হয়নি। তিন কন্যারই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সর্বকনিষ্ঠা কন্যা মুনার বিয়ে হয়েছে, ওস্তাদজীর শিষ্য, আমাদের বন্ধু সিরাজুদ্দিনের সঙ্গে। নিজের দুটি বিবাহে ওস্তাদজী কতখানি সুখী ছিলেন, কখনো অনুমান করতে পারিনি। যতদূর মনে হয়, তাঁর বড় বিবিই সংসারের দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন। তাঁরই এক ফুফার মেয়ের সঙ্গে ওস্তাদজীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছিল। আমার ধারণা, বড় বিবির দুটি মেয়ে হয়েছিল বলেই, তিনি আর একটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু ছোট বিবিও একটি কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন।

আমি জানি, বিবাহিত জীবন ছাড়াও, তাঁর জীবনে মেয়েদের স্থান ছিল। এ কথা বলি না, নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদের অনেক শিষ্যা ছিল। অগণিত নারী-ভক্ত ছিল তাঁর। তাদের অনেকের সঙ্গেই তাঁর দম এবং ওমের সম্পর্ক ছিল। তাঁর নিজের কথা দিয়েই বিষয়টি ব্যাখ্যা করলাম। তাঁর কোন কিছুকেই কখনো অসম্মানের চোখে দেখিনি, বরং তিনি ছিলেন আমার চোখে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, হিরো, এবং দ্বিতীয় জন্মদাতা। তাঁর পাঠান-সুলভ ফরসা স্বাস্থ্যবান চেহারা ছাড়াও, তাঁর প্রতিভাই ছিল সব থেকে বড়। ফিল্মি হিরোদের পেছনে ল্যাং ল্যাং করে ছোটা তথাকথিত ফ্যান্ জাতীয় আবর্জনার থেকেও, ওস্তাদজীর প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরবার মত পতঙ্গ অনেক ছিল।

প্রতিভার আগুনে পতঙ্গদের পুড়ে মরার কথা বলতে গেলে, আর একজন পুরুষের কথা আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে। তিনি পরের দ্বারা অভিহিত মনীষী ছিলেন না। যথার্থ মনীষী ছিলেন। কিন্তু সেই

বাঙালী পুরুষ-শ্রেষ্ঠের নাম আমি উচ্চারণ করব না।

কিন্তু ওস্তাদজী কলকাতার একজন বিশেষ তয়ফাওয়ালীর কাছে যাতায়াত করতেন। তাঁর সঙ্গে আমি কয়েকবার সেখানে গিয়েছি। ওস্তাদজীকে অনেক জায়গায় অনেক ভাবে দেখেছি। কিন্তু সেই তয়ফাওয়ালীর কাছে যখন যেতেন, তখনকার তিনি তুলনাহীন।

মনে হয়, আগে থেকে সংবাদ দিয়ে তিনি সেখানে যেতেন। আর সেখানে গেলে, তাঁর চোখের দৃষ্টিতে এক আশ্চর্য সুষমা নেমে আসত। তাঁর দৃষ্টিতে যে এত গভীর আবেগ ছিল, সেখানে না গেলে কখনো জানতে পারতাম না। তাঁর প্রতিটি কথাই তখন হয়ে উঠত গানের কলি, স্বর সুরেলা। সেখানে যেন তিনি পা টিপে টিপে চলতেন। মত্ত-হস্তীর কুঞ্জবনে প্রবেশের মত কোন ব্যাপার না। যেন এমন এক স্বর্গীয় উদ্যানে এসেছেন, যেখানে পরীরা ঘুমায়। ফুলেরাও নিদ্রা যায়। তিনি সেই স্বর্গীয় কাননের শান্তি নষ্ট করতে চাইতেন না।

মহিলার নাম ছিল আনিসা। আনিসা বেগম। আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তাঁর বয়স নিশ্চয় চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। অন্ততঃ তাঁকে দেখাত প্রায় সেইরকমের। হয়তো আরো বেশি বা কম ছিল, আমি অনুমান করতে পারি না। তাঁর সুবর্ণ দেহে কোনরকমের যৌবনের ঔদ্ধত্য বা উচ্ছ্বাস ছিল না, বরং একটি নম্রতা ছিল, যে-নম্রতার মধ্যেই লুকিয়েছিল আকর্ষণের রহস্য। তাঁর নাকে একটি হীরার নাকছাবি ছাড়া, আর কোন অলঙ্কার দেখিনি। অন্ততঃ ওস্তাদজীর সামনে আর কিছুই পরতেন না। কিন্তু তাঁর চোখে-মুখে একটি হীরার দ্যুতি ছিল, যা তাঁর পোশাকে ঢাকা দেহের নম্রতার সঙ্গে মিলত না। তিনি হাসলেই মনে হত, কী এক আশ্চর্য কিরণ ছড়িয়ে পড়ল। অথচ উনি হাসতেন কম। কথাও খুব বেশি বলতেন না।

ওস্তাদজীর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হত উর্দুতে। দুজনেই কথার মধ্যে অনেক বিখ্যাত বয়েৎ উদ্ধৃত করতেন, আর হাসতেন। আনিসা বেগম ওস্তাদজীকে খুবই সমীহ করে বসাতেন, সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা করতেন।

আমার মনে হত, জানি না, এই মনে হওয়া হয়তো অপরাধ—মনে হত, ওস্তাদজী সমীহ সম্ভ্রমের অভ্যর্থনার থেকে, আনিসা বেগমের কাছ থেকে, প্রিয় রমণীর মত ব্যবহার প্রত্যাশা করতেন। কিন্তু আনিসা বেগম তা কখনো করতেন না। সেটা কি আমি যেদিন সঙ্গে থাকতাম, সেই দিনই ঘটত? নাকি, যখনই তাঁদের সাক্ষাৎ হত, তখনই একই রকম ব্যাপার ঘটত!

ওস্তাদজীর কথাবার্তায় সব সময়েই ফুটে উঠত একটা হতাশা ও বিষণ্ণতা। যেমন উর্দু কোন সায়ের থেকে, তিনি হয়তো বলে উঠতেন, 'আমি কোনকালেই সেই চিরবরফে ফাটল ধরাতে পারলাম না। তুষার সরিয়ে মৃত্তিকা উদ্ধার করতে পারলাম না। অতএব, আমি কোথায় বাগান করব? কোথায় বা ফুল ফোটাব?'

আনিসা বেগম হেসে জবাব দিতেন, 'আপনি এমন একজন বাগিচার স্রষ্টা, যার তুলনা নেই। আমি দেখছি, আপনি আপনার সৃষ্ট বাগিচায় বসে আছেন। বুলবুলির গান শুনে তন্ময় হয়ে আছেন। খোদা আপনার ওপর সত্যি প্রসন্ন।'

ওস্তাদজীর গভীর আবেগের মধ্যে এক করুণ বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠত। বলতেন, 'তাই নাকি? বেশ, আমি তাহলে আমার বাগানে বসে আছি। বুলবুলি গান করুক। কারণ খোদা আমার ওপর সত্যি প্রসন্ন।'

আনিসা বেগমের সেই হাসির কিরণ এমন একটি মুহূর্তেই দেখতে পেতাম। আর তখনই তাঁর কালো চোখে হীরার দ্যুতি। ওস্তাদজী গেলেই তিনি গান করতেন। তবে ওস্তাদজীকে তা বলতে হত। যে ভাবে-ভঙ্গিতেই হোক। আনিসা বেগম গান করতেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে একটি মাধুর্য ছিল। তানপুরা না, হারমোনিয়ম নিয়ে বসতেন স্বয়ং গুরুজী। আর আমাকে বলতেন ঠ্যাকা দিতে। অন্ততঃ যে-ক'দিন আমি গিয়েছি। প্রাণটা তো আর খুলে দেখাতে পারি না। ওস্তাদজীর নির্দেশে, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। ডুগি-তবলায় হাত দিতে গিয়ে, হাত কেঁপে,

ঘেমে, করুণতম অবস্থা হত।

ওস্তাদজী তা বুঝতেন, ভরসা দিয়ে বলতেন, 'বাজা না, বাজা। ভয় পাস না। ঠিক হয়ে যাবে, দেখিস।'

সৌভাগ্য এই, বেঠিক কখনো হয়নি। আনিসা বেগমের সঙ্গে ওস্তাদজী নিজেও স্বর মেলাতেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ওস্তাদজীর স্বর সুর গায়কীর কাছে আনিসা বেগম কিছুই ছিলেন না। ওস্তাদজী গলা দিলেই, গানের চেহারা যেত বদলিয়ে। কিন্তু আনিসা বেগম যে তাঁর জীবনে কিছু ছিলেন, সে বিষয়ে আমি অনেকটাই দ্বিধা-হীন। ওস্তাদজী যখন চলে আসতেন, তখন মনে হত, ভোরের প্রথম আলোয় সহসা মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। এমনই ম্লান আর করুণ দেখাত তাঁকে। অথচ আনিসা বেগমের কোন পরিবর্তনই দেখতাম না। তিনি বিদায় দিতেন তেমনই সমীহ ও সম্ভ্রমের সঙ্গে। ওস্তাদজী চলে আসবার সময় পথে একটি কথাও বলতেন না। গাড়িতে বসেও সুর গুন গুন করতেন। বাড়ি ফিরে প্রচুর সুরা পান করে, আবার তানপুরা পেড়ে নিয়ে বসতেন। ওস্তাদজীর সেই সব মুহূর্তের গানের কোন তুলনা নেই।

যারা হাজার হাজার টাকা দিয়ে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ-জীকে নিয়ে যেত, তারা কখনই সেই দুর্লভ মুহূর্তের, নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদের দুর্লভতম গান শুনতে পায়নি। আমার সেই সৌভাগ্য হয়েছে, এবং চিরকালই মনের মধ্যে একটা ব্যাকুল কৌতূহলাক্রান্ত জিজ্ঞাসা থেকে গিয়েছে, আনিসা বেগমের সঙ্গে ওস্তাদজীর সম্পর্কের মধ্যে এমন কী ছিল, য়া তাঁর প্রতিভার শিখাকে দীপ্ত করে তুলত। হ্যাঁ, ওস্তাদজীর সেই সব মুহূর্তের গান শুনলে, এ কথাই মনে আসে। প্রতিভার আলোকেই তিনি আলোকিত ছিলেন। কিন্তু তার প্রকাশের এক একটি উচ্চতম মুহূর্ত আসে। ইংরেজিতে এ অবস্থাকে হাইটেন্‌ড্‌ মোমেণ্ট্‌ বলে কী না জানি না। সাধকের সাধন পর্যায়ের যেমন এক একটি মুহূর্ত আসে, যখন তিনি সশরীরে বর্তমান থেকেও দেহাতীত এক অন্য

লোকে বিরাজ করেন, সাধারণের চোখে মূর্ছা আর আচ্ছন্নতার আবেশে ডুবে যান, আনিসার কাছে যাওয়া, তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসা, এবং তারপরে গানের মধ্যে ডুবে যাবার সেই দুর্লভতম মুহূর্ত যেন একই রকম। শুধু যে স্বরে সুরে মায়াজাল সৃষ্টি করতেন, তা না। তখন ওস্তাদজীকে দুঃখিত বা বিষণ্ন দেখাত না। তাঁর ধ্যানমগ্ন মুখে ফুটে উঠত প্রসন্ন, আচ্ছন্নতার গভীর আবেশ। চোখের কোণে জল চিক চিক করত, অথচ মুখে হাসি ফুটে থাকত। যেন তিনি এক রহস্যের উন্মোচনে, আপনার মনে আত্মহারা।

অনেকবার ভেবেছি, আনিসা বেগমের কাছে একলা গিয়ে একদিন কথা বলব। ওস্তাদজীকে কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস ছিল না। আনিসা বেগমের কাছে হয়তো কোন রহস্যের কথা জানা যেত। কিন্তু তাও কখনো আমার সাহসে কুলিয়ে ওঠেনি। আনিসা বেগমের নম্রতার মধ্যে যে এক কঠিন ব্যক্তিত্ব ছিল, চোখের তারায় ছিল হীরার দ্যুতি, তা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলে, তাঁর কাছে একলা যাবার উৎসাহ নিভে যেত। তিনি আমাকেও যথেষ্ট স্নেহ করতেন, কিন্তু কেমন একটা ঔদাসীন্যও ছিল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলতেন, 'বয়ঠো বেটা। তসরিফ রাখো।' অথচ জানতাম, আমার অস্তিত্বকে তিনি তেমন আমল দিতেন না।

ওস্তাদজীর আশেপাশে, সুন্দরী রূপসীদের ভিড় তো কম দেখিনি। তাঁর আচরণও সে সব ক্ষেত্রে ছিল, আমুদে, স্পষ্টতঃই এক পুরুষের খুশির আর স্ফূর্তির মেজাজ। যৌবনের উচ্ছলতাই সেখানে আসল কথা। 'উচ্ছৃঙ্খলতা' শব্দ, ওস্তাদজীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আনিসা বেগম ছিলেন সকলের থেকে আলাদা। যৌবন যে তাঁর ছিল না, তা না। যেহেতু যৌবনকে কখনোই তিনি ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রকাশ করতেন না, সেইজন্য এক নম্র কঠিনতা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। রূপের দিক থেকে তিনিই বোধহয় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। অথচ তাঁর পোশাক-আশাকে ছিল আশ্চর্য সহবত। জরদা দিয়ে পান

খেতেন। ঠোঁট দুটি সর্বদাই টুকটুকে লাল দেখেছি। তাঁর চোখ কালো ছিল, তথাপি সুরমা আঁকতেন। তার বেশি প্রসাধন কিছুই দেখিনি।

ওস্তাদজীর মৃত্যুর পরে, একবার তাঁর খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। অসম সাহসে ভর করেই গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, আনিসা বেগমের ঘরে অন্য এক তয়ফাওয়ালী আবাসিক। তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু কোথায় গিয়েছেন, কেউ বলতে পারেনি।

ওস্তাদজী একাত্তর বছর বয়সে মারা গিয়েছেন। আমার অনুমান, আনিসা বেগমের বয়স তখন ষাটের কাছাকাছি হয়েছিল। হিসাবটা ধরছি, প্রায় কুড়ি বছরের মধ্যে, বার পাঁচেক ওস্তাদজী আমাকে আনিসা বেগমের গৃহে নিয়ে গিয়েছিলেন। যেহেতু প্রথম দর্শনে তাঁকে আমার চল্লিশের মত মনে হয়েছিল, সেই হিসাবে ষাটের ঘরে ভেবেছি।

কিন্তু কোথায় গেলেন মহিলা? ওস্তাদজীর মৃত্যুর সঙ্গে, তাঁর কলকাতা ত্যাগের কোন যোগসূত্র ছিল কী? আমার পক্ষে সে-রহস্য কোনকালেই জানা সম্ভব না। তবে নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খান, আর তয়ফাওয়াড় আনিসা বেগম, এই দুটি চরিত্রের রহস্য আমাকে চিরকালই একটি তীব্র জিজ্ঞাসায় কৌতূহলাক্রান্ত করে রেখেছে। রাখবে, যতকাল বাঁচব।

কী একটা স্টেশন বোধহয় এল। গাড়ির গতি কমে আসছে। আমি জানলার থেকে মুখ সরিয়ে, বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজলাম। ঘুমোতে চাই। কিন্তু চাইলেই কি ঘুম আসে? আমার বিক্ষুব্ধ জীবনটা অন্ধকারে, চোখের সামনে তোলপাড় করছে।

চিরকালই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ছিলাম না। এই অসুখ আর অসন্তুষ্টি, অপূর্ণতার বোধ, আত্মার গ্লানি, সবই প্রায় এক দশকের বিষয়। প্রচলিত সেই শব্দটি 'প্রতিষ্ঠা' যখন থেকে শুরু। স্বীকৃতি তার আগেই পেয়েছিলাম, প্রতিশ্রুতিবান বা উদীয়মান বিশেষণগুলো যখন থেকে আমার সম্পর্কে ব্যবহৃত হচ্ছিল।

কে আমাকে গানের দিকে প্রথম আকৃষ্ট করেছিলেন? তার আগে ভাবা দরকার, আমি বিষ্ণুপুর শহরের কোন্ বাড়ির ছেলে। এক সময়ে আমাদের পরিবারের পণ্ডিত বংশ বলে খ্যাতি ছিল। আমার সময়ে আমি দেখেছি, যজমানি আর পৌরোহিত্যই, আমাদের পরিবার এবং শরিকদের একমাত্র জীবিকা। অবিশ্যি জমিজমার সম্পত্তি কিছু কম ছিল না। প্রায় সারা বৎসরের অন্ন জমি থেকেই জুটত। তা দেখাশোনার দরকার ছিল। তবে যজমানি ব্যবসাটি আমাদের পরিবারের অতি প্রাচীন এবং ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত। আমাদের যজমানরা বিভিন্ন প্রদেশের লোক, তার মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট ধনী সম্প্রদায়ের লোক। প্রধানতঃ বম্বে এবং আহমেদাবাদেই সেই যজমানদের বাস। আমাদের শরিক পরিবারগুলোর কোন কোন ছেলে, কিছু লেখাপড়া শিখে, সেই যজমানদের মারফতই ভালো চাকুরি জুটিয়ে নিয়েছে। ভারতবর্ষের মত, কুল-গুরু এবং গুরুর বংশধরদের প্রতি, এতখানি আনুগত্য, ভক্তি, পৃথিবীর আর কোথাও আছে কী না, আমি জানি না।

আমাদের পরিবারেও সেই জাতীয় চিন্তা ছিল, এবং আমাকে সেই হিসাবেই লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল। আমার এক নিঃসন্তান কাকা, কাকীমাকে নিয়ে বাসা ভাড়া করে কলকাতায় থাকতেন। তিনিই ছিলেন আমাদের পরিবারের একমাত্র গ্র্যাজুয়েট। সরকারী কেরানী ছিলেন রাইটার্স বিল্ডিং-এ। বাবা জ্যাঠামশাই, দুজনেই যজমানি আর পৌরোহিত্য যাগ-যজ্ঞ পূজাপাট নিয়ে থাকতেন।

আমার সৌভাগ্য, বাবা কেবল সে-সব নিয়েই কাটাতেন না। তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন, রামরতন চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপরি ঘরানার গায়ক হিসাবে যাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। রামরতন চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্গীয় পিতা রাজেশ্বর চট্টোপাধ্যায়কে সারা দেশ চিনত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধক গায়ক হিসাবে। রামরতন তাঁর পিতারই যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন। আমার সৌভাগ্যের কথা বলছিলাম এই কারণে, আমার বাবার গানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। রামরতন কেবল তাঁর বন্ধু ছিলেন না।

বাবার মধ্যে যে সঙ্গীতের একটা প্রচ্ছন্ন ধারা প্রবহমাণ ছিল, রামরতন তা আবিষ্কার করেছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গীতের আসরে বাবার প্রায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। মাঝে-মধ্যে বাবা আমাকে রামরতনের গৃহে, গানের আসরে নিয়ে যেতেন।

আমার পরিষ্কার মনে আছে, রামরতন আমার বাবাকে রীতিমত ধমক দিয়ে বলতেন, 'ব্রজ, তুমি ক'দিন না এসে খুব অন্যায় করেছ। আমি তোমার পথ চেয়ে বসেছিলাম। কথা দিয়ে কথা না রাখলে, আমার ভারি বিরক্ত লাগে।'

আমার বাবার নাম ছিল ব্রজমোহন চক্রবর্তী। রামরতনের ধমকে বাবাকে সঙ্কুচিত হয়ে হাসতে দেখতাম, এবং তাঁর একটিই মাত্র কৈফিয়ৎ ছিল, বিশেষ বাড়িতে বিশেষ পূজা-পাটের জন্য তিনি আসতে পারেন-নি। এ জাতীয় কৈফিয়তে, রামরতন আরো বেশি বিরক্ত হতেন, বলতেন, 'জীবনটা একেবারে বাজে কাজেই নষ্ট করলে।'

রামরতন বাবার বন্ধু হলেও, বাবা বেশি বয়সে বিবাহ করেছিলেন। রামরতনের সন্তানের সংখ্যা এবং বয়স তখন বেশি হয়েছিল। তাঁর প্রায় কুড়ি বছরের একটি বিধবা মেয়ে ছিল, যাঁকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন, এবং নিয়মিত গান শেখাতেন। তাঁর নাম ছিল রমা, রামরতন তাঁকে রমু বলে ডাকতেন। আমি তাঁকে রমুদি বলে ডাকতাম। রমুদি নিয়মিত গানের আসরে বসতেন, তানপুরা ধরতেন, এবং গান করতেন। রাম-রতনের সঙ্গে বাবাও আশ্চর্য রকম ভাবে গলা মেলাতেন।

আশ্চর্যরকম এই কারণে, বাবা যে গাইতে পারেন, এটা ছিল আমার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার। আমার বাবা ছাড়াও, অনেক অল্পবয়সী শিষ্য রামরতনের ছিল। সপ্তাহের মধ্যে, তাদের দিন ভাগ করা ছিল। বাবার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ছিল না। রামরতন মাসে বার দুয়েক কলকাতায় যেতেন। তখনো বাবা তাঁর বাড়িতে যেতেন, তানপুরা বাজিয়ে গান করতেন। তবলা-বাদক ছিলেন প্রধানতঃ তাঁতীবাড়ির বৈকুণ্ঠ দাস। পাখোয়াজ বাজাতেন রতন লোহার। অবিশ্যি রামরতন নিজেও ভালো

পাখোয়াজ বাজাতেন।

বাবার সঙ্গে মায়ের একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, প্রায়ই বিবাদের চাপা আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠত। অতি শৈশবেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম। কেন্দ্রটি ছিলেন রমুদি। মাকে আমি বিদ্রূপ আর ধিক্কারের স্বরে বলতে শুনেছি, 'গান না, অন্য মধু সেখানে আছে। সেই লোভেই সেখানে যাওয়া!'

বাবা অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন, কিন্তু প্রকাশ করতেন না, কেবল বলতেন, 'সে আমার মেয়ের মতন, মেয়েই বলা যায়। তোমার মন অত্যন্ত নীচ, তাই এরকমটি ভাবছ।'

বাবা মা আমার সামনে এসব বিষয় নিয়ে, নিচু উত্তেজিত স্বরে কথাবার্তা বলতেন। তাঁদের ধারণা ছিল, আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু বুঝতাম। শুধু বুঝতাম না। রামরতনের গৃহে, বাবার সঙ্গে গিয়ে, আমি রমুদি আর বাবার দিকে বিশেষ তীক্ষ্ণ নজর রাখতাম। কেন না, মনে মনে মায়ের প্রতিই আমার বিশ্বাস ছিল বেশি। কিন্তু মায়ের অভিযোগের কিছুই দেখতে পেতাম না।

এখন সে-সব কথা ভাবলে, খুবই লজ্জা করে, আর একটা হীনমন্যতা-বোধ জেগে ওঠে। সংসারে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ব্যাপারে, প্রচলিত বিশ্বাসগুলো কত মিথ্যা, মুখোশ দিয়ে ঢাকা, বুঝতে পারি। বাবার সঙ্গে রমুদির যদি কোন সম্পর্ক গড়ে উঠত, তাহলেই বা আমার কী করার ছিল?. কিন্তু তখন তা বুঝতাম না। অবিশ্যি পরে রমুদি কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন, এবং তিনি আবার বিয়েও করেছিলেন। সেই বিয়ে করার পরে, তিনি আর কখনো বিষ্ণুপুরে আসেননি। বিয়ে হয়েছিল রামরতনেরই কলকাতার এক প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে। রমুদি গানে কখনো তেমন খ্যাতিলাভ করতে পারেননি। তবে বিষ্ণুপুরি ঘরানার খেয়াল ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের নিয়মিত বেতার-শিল্পী ছিলেন।

বাবার সঙ্গে সেই যে ছেলেবেলায় রামরতনের গৃহে, গানের আসরে যাতায়াত করতাম, গানের বীজ তখন থেকেই আমার মধ্যে প্রবেশ করে।

অন্যমনস্কভাবে কখনো গেয়ে উঠলে, বাবা চমকিয়ে উঠে বলতেন, 'সুরটা ঠিক ধরেছিস তো! বল্, বাকিটা শুনি।'

আমি লজ্জা পেতাম, মনে মনে খুশিও হতাম, কিন্তু আর তৎক্ষণাৎ গাইতে পারতাম না। আমার গান গাওয়া, বাবার অবাক প্রশংসা, এসব কোন কিছুই আমার মায়ের পছন্দ ছিল না। তিনি বলতেন, 'হ্যাঁ, এখন থেকে বাউরি পাড়ায় গিয়ে সঙের মহড়া দে, মুক্‌খু হয়ে থাক! বামুনের ঘরের ছেলের কপালে এ ছাড়া আর কিছু নেই দেখছি।'

এই হিসাবে বাবা আমার প্রথম গুরু। দ্বিতীয় গুরু রমুদি। আমি সকালে বিকালে অনেক সময়েই একলা রামরতনের গৃহে চলে যেতাম। রমুদি হয়তো একলাই রেওয়াজ করতেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম। এই শোনা দেখেই, রমুদির একদা সহসা খেয়াল হয়েছিল, আমাকে তাঁর সঙ্গে গান করতে বলেছিলেন। লজ্জা কাটাতে সময় লেগেছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে, শুধু রমুদির সঙ্গে আমার শিক্ষা চলত। এ ভাবেই একদা, রামরতনের সামনে পড়ে গেলাম। তিনি আমার গলায়, গায়কি, শ্রুতি এবং ধরতাই শুনে এবং দেখে ভীষণ খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'ব্রজর ব্যাটা দেখছি বেশ তালেবর আছে। আয় দেখি, তোকে নিয়ে আমি একটু খুস্তিনাড়া করি।'

দ্বিতীয় গুরুর পরে, রামরতন আমার তৃতীয় গুরু। রামরতনের কাছে আমার কথা শুনে, বাবা হয়তো মনে মনে খুশি হয়েছিলেন, বাইরে প্রকাশ করেন নি। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া কর। গান নিয়ে থাকলে তোমার জীবন চলবে না।'

আমার বারো বছর বয়সের সময়, কাকা আমাকে কলকাতায় তাঁর কাছে নিয়ে রাখতে চাইলেন। বাবা-মা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়েছিলেন। কারণ আমার আরো পাঁচটি ভাই-বোন ছিল। সকলের বড় বোন। ইতিমধ্যে আমি গানে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছিলাম। কলকাতা যাবার প্রস্তাবে আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যদিও বারো বছর বয়সেই আমি ভাবতাম, রামরতন বা তাঁর পিতা রাজেশ্বরের

মত আমিও একদা ভবিষ্যতে কলকাতা যাব। কিন্তু বারো বছর বয়সে যেতে চাইনি। কারণ বারো বছর বয়সে কলকাতায় গিয়ে, ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া ছাড়া আমার আর কিছুই করার ছিল না।

তথাপি আমাকে যেতে হয়েছিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে কলকাতায় গিয়েছিলাম। সবাই ভেবেছিল, বিষ্ণুপুর ছাড়ার শোকেই আমার কান্না। একদিক থেকে তাই, কিন্তু বিষ্ণুপুরে তখন আমার অন্য এক জগৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আসলে বুঝতে পারি নি কলকাতায় যাওয়া আমার ভবিষ্যতের শাপে বর হয়েছিল।

কাকা আমাকে একটি ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইস্কুলে আর পাড়ায় অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছিল। রেডিও তখন ঘরে ঘরে ছিল না। তবে বিষ্ণুপুরের তুলনায়, অনেকের ঘরেই ছিল। মধ্য-কলকাতায় আমার কাকার বাসা যেখানে ছিল, সেই অঞ্চলকে ঠিক মধ্য কলকাতা বলা যায় না। উত্তর-ঘেঁষা মধ্য-কলকাতা। পাড়ায় প্রদীপ নামে আমার একটি বন্ধু জুটেছিল। ওর বাবা ছিলেন ডাক্তার। ওদের বাড়িতে রেডিও ছিল। আমি প্রায়ই শুনতে যেতাম।

আমার আচরণের মধ্যে একটা গ্রাম্য সরলতা ছিল। সেই সঙ্গে ছিল বিষ্ণুপুরি কথার টান। চেহারাটাও খারাপ ছিল না। প্রদীপদের বাড়িতে, ওর বাবা মা দাদা দিদিরা আমাকে পছন্দ করতেন। প্রদীপদের বাড়ির কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে কারণ ওদের বাড়ির রেডিওতেই আমি প্রথম নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের গান শুনি। বিষ্ণুপুরি ঘরানার সঙ্গে, সেই গানের অনেক অমিল। কিন্তু আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

আমি কিছু বলার আগে, প্রদীপ কখনো জানতে পারেনি, গান নিয়ে আমার কোন ঔৎসুক্য আছে। নিতান্ত বাইরের মফস্বলের ছেলে, রেডিও শুনতে ভালবাসি, তাই প্রায় রোজই রেডিও শুনতে যাই, এটাই ছিল ওর আর ওদের বাড়ির সকলের ধারণা।

রেডিওতে আমি অনেকের গানই শুনেছি। কিন্তু নাসিরুদ্দিনকে

কখনোই ভুলতে পারছিলাম না। বর্তমানের মত, তখনকার কলকাতায়, কথায় কথায় সঙ্গীত সম্মেলনের প্রচলন ছিল না, অতএব খবরের কাগজে বা পোস্টারে শিল্পীদের নাম আর গানের আসরের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি ছিল না।

এক বছরে, নাসিরুদ্দিনের গান, চার বার রেডিওতে শুনেছিলাম। হয়তো আরো হয়েছিল। আমার শোনা হয়নি। প্রদীপদের বাড়িতে গ্রামোফোনও ছিল। আশ্চর্য, নাসিরুদ্দিনের গানের কোন রেকর্ড ওদের ছিল না। ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কে. মল্লিক, কানাকেষ্ট, কাননবালা, পঙ্কজ মল্লিক, এঁদের অনেক রেকর্ড ছিল। আমি প্রদীপকে একদিন জিজ্ঞাসা করে জবাব পেয়েছিলাম, 'ওসব তো ওস্তাদি গান।'

অর্থাৎ নাসিরুদ্দিনের গান ওস্তাদি গান, যার মানে হয়তো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। অথচ ইন্দুবালা আঙুরবালাও তো সহজ গান করেন না? গজল ঠুংরিতে তাঁরাও ওস্তাদ। কলকাতায় যাবার একবছর পরে, প্রদীপকে বলেছিলাম, আমি নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের সঙ্গে দেখা করতে চাই। প্রদীপ প্রথম দিকে তেমনি আমল দেয়নি। রামরতন তখন কলকাতায় ছিলেন। তাঁর কাছেও আমার যাবার খুব ইচ্ছা হত। কিন্তু নাসিরুদ্দিনের গান শোনার পরে, রামরতনের কাছে যাবার ইচ্ছাটা কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছিল। প্রদীপ নাসিরুদ্দিনের কাছে যাবার জন্য কোন উৎসাহ দেখায়নি, বরং এক রকমের অনিচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছিল।

আরো ছ'মাস কেটে গিয়েছিল। আমি ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। এই সময়ে, ইস্কুলের একটি বন্ধু, যে এণ্টালি থেকে আসত, তার সঙ্গে কথায় কথায় জেনেছিলাম, ওদের বাড়ির কাছেই এক বাড়িতে নাসিরুদ্দিন আহমেদ খান মাঝে মাঝে বেড়াতে আসেন। গানও করেন। ছেলেটি ছিল দেশীয় খৃষ্টান, নাম সাইমন, কিন্তু পড়ত আমাদের ইস্কুলে। আমি সাইমনকে ধরে বসেছিলাম। সাইমন আমাকে আশ্বাস দিয়েছিল, ও আমাকে ওস্তাদজীর ঠিকানা যোগাড় করে দেবে, এবং

সুযোগ পেলেই একদিন তাঁকে দেখিয়ে দেবে।

এই সময়ে কাকা একদিন বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে রামরতন চট্টো-পাধ্যায়ের দেখা হয়েছে ; তিনি আমাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। কাকার সঙ্গেই আমি রামরতনের কলকাতার বাসায় গিয়েছিলাম। বিষ্ণু-পুরের বাড়ির তুলনায়, কলকাতার বাড়ি কিছুই না। চেহারার মধ্যেও কেমন দারিদ্র্য ছিল। কিন্তু রামরতন তাঁর নিজের মতই ছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী রে বিশু, গান-টান সব ছেড়ে দিয়েছিস ? কাকার কাছে কলকাতায় এসে লেখাপড়া শিখে দিগ্‌গজ হচ্ছিস ?'

কাকা রামরতনের বিদ্রূপে অস্বস্তিবোধ করে বলেছিলেন, 'একথা কেন বলছেন রামদা ? আমরা স্বামী-স্ত্রী একেবারে একলা কলকাতায় পড়ে থাকি। বিশেষ করে বিশুর কাকীমার খুব খারাপ কাটত। তাই ওকে এখানে এনে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি। দিগ্‌গজ হবে কী ন জানি না, লেখাপড়া করছে। গত বছর ভালভাবেই প্রমোশন পেয়ে ক্লাশ নাইনে উঠেছে। আপনি যদি ওকে মাঝে-মধ্যে নিয়ে বসতে চান, বসুন না। মেজদাও (আমার বাবা) আমাকে সেই রকম বলে-ছিলেন।'

বলা-বাহুল্য, ইতিমধ্যে বার তিনেক আমি বিষ্ণুপুর ঘুরে এসেছিলাম বাবা আমাকে কখনো গানের বিষয়ে কিছু বলেননি। রামরতন আমাকে তানপুরা নিয়ে বসতে বলে, বলেছিলেন, 'এসব হচ্ছে চর্চার বিষয়। একবার ছেড়ে দিলে, আর সহজে আসতে চায় না।'

এ বিষয়ে ছেলেবেলাতেই আমার চিন্তা ছিল ভিন্ন রকম। গান নিশ্চয় চর্চার বিষয়, কিন্তু একবার ছেড়ে দিলেই, সে ছেড়ে যায়, এট আমি বিশ্বাস করি না। বরং আমার ধারণা, যার ভিতরে গান জন্ম নেয় তা অনেকটা সাঁতার শেখার মত। একবার শিখলে আর কখনো জলে ডুবে যাওয়া যায় না। অবিশ্যি চর্চা থাকলে, কলা কারুমিতি বাড়তে পারে। অথবা এখন বলতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বের বিষ মন্থিত করে, সাগরে যে-অমৃতের উত্থান হয়েছিল, সেই অমৃতের স্বাদের মত। একবার সে

স্বাদ গ্রহণ করলে, আর কদাপি ভোলা যায় না। আমি নিজের হাতে তানপুরা বেঁধে, রামরতনের শেখানো গান গেয়েই তা প্রমাণ করেছিলাম।

তিনি অবাক হয়েছিলেন, খুশি হয়ে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'ব্রজর ছেলেটার দেখছি সত্যিকারের এলেম আছে। ব্যাটা তালে পর্যন্ত একটুও ভুল করেনি। তুই কি চর্চা করিস নাকি?'

জবাবটা কাকাই দিয়েছিলেন, 'কী দিয়ে চর্চা করবে? আমার বাড়িতে তো একটা হারমোনিয়ম পর্যন্ত নেই।'

আমি সসংকোচে বলেছিলাম, 'আমি একটা গানের টুকরো আপনাকে শোনাব?'

রামরতন খুশি উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, 'বটে! শোনা দেখি।'

নাসিরুদ্দিনের রেডিওতে শোনা গানের এক কলি আলাপ করে তাঁকে শুনিয়েছিলাম। তানপুরা ছাড়া। তিনি অবাক গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এ তো নাসিরের গান! তুই কোথায় পেলি?'

'রেডিওতে শুনেছিলাম।'

'সেই শুনেই এরকম মনে রেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তুই দেখছি সত্যিকারের শ্রুতিধর। তবে এ হচ্ছে ভিন্ন ঘরানার গান।'

'আমার ভাল লাগে।'

আমার এ কথায় রামরতন খুশি হননি। তিনি কাকাকে বলেছিলেন, আমি যেন মাঝে-মধ্যে তাঁর কাছে যাই। তারপরেই কয়েকদিন বাদে আমার সেই শুভদিন এসেছিল। আমি খবরের কাগজে একটি ছোট সংবাদ পড়েছিলাম, নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের গুরু অলখিয়া প্রকাশজী কলকাতায় এসেছেন। উদ্দেশ্য, কলকাতার গুণী শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এবং একটি বিশেষ বাড়িতে গান পরিবেশন করবেন। সেই বাড়ির ঠিকানা ও তারিখ দেওয়া ছিল। সময়টা ছিল

সন্ধ্যা। আমার পক্ষে সময়টা ভাল না। পড়াশোনা করতে বসার কথা। কিন্তু আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। সঙ্গে সাইমনকে নিয়ে গিয়েছিলাম।

অল্‌খিয়া প্রকাশজীর গান শুনতে পাওয়া যতটা সহজসাধ্য ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা আদৌ তা না। যে-বাড়িতে তিনি গান গাইতে গিয়েছিলেন, কলকাতার বিখ্যাত এক নাম-করা ধনী পরিবার। গেটের দরোয়ান আমাদের ঢুকতেই দেয়নি। অথচ আমার চোখের সামনে দিয়ে, মোটর গাড়ি ঘোড়ার গাড়িতে চেপে, কেউ বা পায়ে হেঁটেও, গান শুনতে গিয়েছিলেন। গেটে দাঁড়িয়ে থেকেও, অল্‌খিয়ার গান শুনতে পাইনি। কারণ তখনো কথায় কথায় মাইকের ব্যবহার হত না। বিশেষ করে বাড়ির মধ্যে কোন অনুষ্ঠানে তো নয়ই।

হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলাম। কাকা-কাকীমার কাছে বকুনিও খেয়েছিলাম। এ ঘটনার দুদিন পরেই সাইমন আমাকে নাসিরুদ্দিনের বাড়ির ঠিকানা যোগাড় করে এনে দিয়েছিল। পার্ক সার্কাসের এক অঞ্চলে তিনি বাস করতেন। কিন্তু একলা যাবার সাহস আমার ছিল না। রবিবারের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

সাইমনকে সঙ্গে করে, রবিবারের সকালে, ভগবানের নাম জপতে জপতে সেই বাড়ির ঠিকানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। নোকর খিদ্‌মদ্‌গারেরা দুটো ছেলেকে কোন পাত্তাই দিতে চায়নি। জানিয়েছিল, খান সাহেব তখনো ঘুমোচ্ছেন। বেলা দশটায় ঘুমোচ্ছেন! আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু সাইমন বলেছিল, 'ওসব লোক তো নেশা-ভাং করে, অনেক রাত্রে ঘুমোয়। এরা অনেক বেলায় ঘুম থেকে ওঠে।'

সাইমনের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করিনি। মনে মনে বিরক্তও হয়েছিলাম। কার সম্পর্কে কী কথা! পরে অবিশ্যি বুঝেছিলাম, সাইমন একেবারে ভুল বলেনি। ওস্তাদজী প্রায়ই ঘুম থেকে উঠতে বিলম্ব করতেন। বিশেষ করে আগের গোটা রাত্রিটাই যদি জেগে

থাকতেন। নানা কারণেই জাগতে হত।

আমি সাইমনের সঙ্গে বেলা বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। নোকর খিদ্‌মদ্‌গারেরা আমাদের ওপর বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু একটি বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লোকের কী করুণা হয়েছিল, সে আমাদের ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমার বুকের মধ্যে এত তুরু তুরু করছিল, মনে হচ্ছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে মরেই না যাই। রক্ত রীতিমত তোলপাড় করছিল।

বাড়ির নিচের তলার তুটো ঘর ছাড়িয়ে, একটা ঘরে বৃদ্ধ আমাদের নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে লাল মেঝের ওপরে উঁচু মোটা বিরাট গদীর ওপরে, ওস্তাদজী লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি গায়ে, তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে-ছিলেন। বৃদ্ধ বলেছিল, 'সাব, এ দো লেড়কা সবের সে ঠারতা, আপকো দেখনে কো লিয়ে।'

ওস্তাদজী আমাদের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন। পাঠান চেহারার লোকটির তুই চোখ বেশ আরক্ত। চোখে চোখ রাখে, কার সাধ্য! গলায় একটা সোনার তাবিজ, বুক খোলা পাঞ্জাবির ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। তিনি তাঁর সেই আশ্চর্য গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, 'কী চাই? আমাকে দেখতে এসেছিস?'

আমি আর সাইমন ধরা পড়া চোরের মত নিজেদের দিকে তাকিয়ে-ছিলাম। তারপরে মুখ নামিয়ে নিয়েছিলাম। জবাব দিতে পারিনি।

ওস্তাদজী একটু যেন হেসে উঠে বলেছিলেন, 'তোরা কি বোবা নাকি রে? তোদের নাম কী?'

সাইমন প্রথমে ওর নাম বলেছিল। ওস্তাদজী আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তোর কী নাম?'

স্খলিত স্বরে, কোনরকমে নিজের নামটা উচ্চারণ করেই, আমি নিচু হয়ে, প্রায় হামা দিয়ে গদীর ওপরে তাঁর তু পা ছুঁয়ে মাথায় ঠেকিয়ে-ছিলাম। ওরকম একটা ব্যাপারের জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, 'আরে আরে, ব্রামভনের বেটা,

তুই আমার পায়ে হাত দিচ্ছিস! তোবা তোবা! বোস দেখি, শুনি তোদের কথা? কী পড়িস তোরা?'

সাইমনই জবাব দিয়েছিল, 'আমরা ক্লাস নাইনে পড়ি।'

'আচ্ছা, গদীর ওপরে বোস।' ওস্তাদজী আমাদের আদেশ করেছিলেন।

আমি বসে, চোখ তুলতেই, তাঁর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়েছিল। আর সাইমন হিন্দীতে বলেছিল, 'আমার বন্ধু আপনাকে ওর গুরু করতে চায়।'

'গুরু? কিসের গুরু?'

'গানের।'

'গানের? তাই নাকি রে? কেন? আমাকে গুরু করতে চাস কেন?'

আমি একটি কিশোরী প্রেমিকার মত, তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপরেই আমি নিজেও অবাক, হঠাৎ আমার চোখে জল এসে পড়েছিল। ওস্তাদজী হা হা করে উঠেছিলেন, 'আরে দেখো, দেখো বেটা রোতা হ্যায়।' বলে, আমার একটা হাত ধরে, কাছে টেনে নিয়েছিলেন।

আমি তাঁর গায়ে আতরের গন্ধ পেয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই আমার গান কখনো শুনেছিস?'

'শুনেছি।'

'কোথায়?'

'রেডিওতে।'

'ওহ্, রেডিওতে? কোন আসরে না?'

আমি মাথা নিচু করেই বলেছিলাম, 'অলখিয়া প্রকাশজীর গান শুনতে গিয়েছিলাম, তখন তাঁর গান শুনতে পাব, এই আশা ছিল। কিন্তু সে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি।'

'তা তো দেবেই না। তুই অচেনা, তায় বাচ্ছা ছেলে, ওখানে তোকে

কখনো ঢুকতে দেয় ? তা তুই কি কারোর কাছে গান শিখিস ?'

বলেছিলাম, 'রামরতন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অল্পসল্প শিখেছি।

ওস্তাদজী অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'রামরতনদাদা ! তাঁর সঙ্গে তোর চেনা হল কেমন করে ?'

আমি বিষ্ণুপুরের কথা সংক্ষেপে বলেছিলাম। ওস্তাদজী বলেছিলেন, 'তুই তো ভাল লোকের কাছেই শিখছিস ? আমার কাছে কেন এসেছিস ?'

'আমি আপনার কাছে শিখতে চাই।'

ওস্তাদজী একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, 'একটু সারগম ছাড় তো।'

আমি আশেপাশে হারমোনিয়ম বা তানপুরার জন্য তাকিয়েছিলাম। তিনি ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, 'আরে লে লে বেটা, তোর খালি গলাটাই শুনি।'

মনে হচ্ছিল, আমার গলায় কেউ পাথর গুঁজে দিয়েছে। ঘামতে আরম্ভ করেছিলাম। ভিতর থেকে স্বর এলেও, গলায় যেন ফুটতে চাইছিল না। কিন্তু সুযোগ না হারাতে আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম। কেন না, হারালে হয়তো আর পাব না, এই ভেবেছিলাম। আমি কয়েকবার গলাখাঁকারি দিয়ে, সারগম সেধেছিলাম। থামতেই তিনি বলেছিলেন, 'ছেড়ে যা ছেড়ে যা, ওঠ্ বোস কর।'

ওঠ্ বোস কর মানে, স্বরের ওঠা-নামা। ওস্তাদজী বলেছিলেন, 'বেড়ে যা, বেড়ে যা।'

বেড়ে যা বলতে কী বুঝিয়েছিলেন জানি না। আমি সারগমের মধ্যে তাঁরই একটি বাগেশ্রী রাগের সুর ধরেছিলাম। ভেবেছিলাম, তিনিও রামরতনের মত ঘরানার প্রশ্ন তুলবেন। তোলেননি। চোখ বুজে, গদীর ওপর হাত দিয়ে তাল দিচ্ছিলেন। তারপরে হঠাৎ গদীর ওপর চাপড় মেরে, ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, 'তালে ভুল করলি।'

আমি থেমে গিয়েছিলাম, ভয়ে হতাশায় একেবারে কুঁকড়ে

গিয়েছিলাম। তিনি নিজেই গুণগুণিয়ে উঠে, তাল দিয়েছিলেন, আর আমার ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধকে ডেকে বলেছিলেন, 'রহমন ভাইয়া, বাচ্চা ছুটোকে একটু শরবত পানি পিলাও।'

তারপরে আমার বাড়ির খোঁজখবর নিয়েছিলেন। কে কে আছেন, ক' ভাইবোন, বাবা কাকা জ্যাঠারা কী করেন, ইত্যাদি। ইতিমধ্যে শরবত এসেছিল। লেবু-চিনির জল। কিঞ্চিৎ গোলাপী গন্ধযুক্ত। ওস্তাদজী জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই ব্রামভনের বেটা, আমার ঘরে শরবত খেয়ে তোর জাত গেল না?'

বয়সটা ছিল নিতান্তই কম, ভাষায় দখল ছিল না। তাই কেবল বলেছিলাম, 'আপনার কাছে আমার কোন জাত নেই।'

'তোবা তোবা! জাত নেই কীরে? কিন্তু তুই যে আমার কাছে গান শিখতে আসবি, বাড়ির লোকেরা রাগ করবেন না?'

'রাগ করলে আমি কী করব? আমি আপনার কাছে গান শিখতে চাই।'

'বাড়ি থেকে যদি তাড়িয়ে দেয়?'

'তবু শিখব।'

ওস্তাদজী হেসে বলেছিলেন, 'রোখা আছিস দেখছি। আচ্ছা, লেখাপড়ায় ফাঁকি না দিয়ে, এইরকম রবিবারে আসিস, দেখব। তবে তোকে রোজ রেওয়াজ তো করতে হবে।'

'করব।'

'কী করে করবি? হারমোনিয়ম আছে?'

'কিনব।'

'টাকা পাবি কোথায়?'

'বাবাকে বলব।'

'কিন্তু লেখাপড়া?'

'লেখাপড়াও করব, গানও শিখব।'

'আর খেলাধুলা বরবাদ?'

আমি চুপ করে ছিলাম। তিনিও আর কথা বাড়াননি। বিদায় দিয়েছিলেন। আসলে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, আমার দৌড় কত দূর। কতখানি বদ্ধপরিকর আমি।

বেলা ছুটোর পরে বাড়ি ফিরেছিলাম। কাকা-কাকীমা খুব রেগেছিলেন। আমি প্রতিবাদ করিনি, ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে চুপ করে ছিলাম। সেইদিনই রাত্রে সব কথা জানিয়ে আমাকে একটা হারমোনিয়ম কিনে দেবার জন্য বাবাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। বাবার পায়ে ধরে অনুরোধ করেছিলাম, যেন তিনি আমার কথা রাখেন। তাঁকে আশ্বস্ত করে কথা দিয়েছিলাম, আমি লেখাপড়া ঠিক মত চালিয়ে যাব, কোন অন্যথা করব না। কিন্তু তিনি যেন আমাকে একটি হারমোনিয়ম আর ডুগি-তবলা থেকে বঞ্চিত না করেন।

পরের দিন চিঠিটা ডাকে ফেলে, বুক ছুরু ছুরু উদ্বেগ নিয়ে, একটা তিক্ত ক্রুদ্ধ জবাবের আশঙ্কায় ছিলাম। কিন্তু আমাকে চমকিয়ে দিয়ে, খুশিতে প্রায় উন্মাদ করে দিয়ে, বাবা*দীর্ঘ ছুই সপ্তাহ বাদে নিজে কলকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি কাপড় জড়ানো তানপুরা, আর একজোড়া ডুগি-তবলা।

আমি আগেই বলেছি, এক হিসাবে বাবাই আমার প্রথম গুরু। পরবর্তীকালে, বাউলদের সেই গানটি আমি মনে-প্রাণে মেনেছি, 'গুরু বলে কারে প্রণাম করব মন! আমার অথিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।'···তবে হ্যাঁ, মন্ত্রগুরু বলে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি ওস্তাদজী। বোধহয় ভুল বললাম। ওস্তাদজী আমার প্রাণের গুরু। তিনিই আমার ঈশ্বর।

বাবার উৎসাহ দেখে কাকা কাকীমা তেমন অসন্তুষ্ট হননি। কিন্তু রামরতনকে ছেড়ে আমি নাসিরুদ্দিনের সাকরেদি করতে চাই, এটা তাঁদের ভাল লাগেনি। বিষ্ণুপুর ছেড়ে ইন্দোর ঘরানায় কেন? এ যেন, ছেলের ঘর ছেড়ে চিরদিনের জন্য প্রবাসে চলে যাওয়ার মতো।

কিন্তু আমার তখন সে-বয়স হয় নি। তাঁদের বুঝিয়ে বলি যে,

বিষ্ণুপুরের ঘরানাই আমার রক্তে, আর সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে, নতুন রূপ ও মাধুর্যই আমাকে আকর্ষণ করছে। আমি যে যদুভট্টর দেশের সন্তান, সে কথা আমি ভুলতে পারি না।

তারপরেও বছর খানেক ওস্তাদজীর কাছে কেবল প্রতি সপ্তাহে রবিবারে একবার যেতাম। সব রবিবারে দেখাও হত না। হয়তো আগের রাত্রেই কোথাও চলে যেতেন, ফিরতেন কয়েকদিন পরে। তা ছাড়া, সারা ভারতে গানের জন্য ছুটোছুটি তো ছিলই।

দু বছর পরে আমার সেই শুভদিনটি এসেছিল। তখন আমি ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্র। ওস্তাদজীর কাছে আমার নাড়া বাঁধা হয়েছিল। তিনি আমাকে খাঁটি জরির বেনারসী রাখী পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তাঁকে রেশমের ওপর বালুচরি আঁচলের কলকা বসানো পাঞ্জাবী আর লুঙ্গি দিয়েছিলাম। সেই পোষাকে তাঁকে একজন শাহাজাদার মতো মানিয়েছিল।

অনেক লোকের নানা কলরবে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ তাকিয়ে দেখলাম, কুপের মধ্যে দিনের আলো। জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে। হৈ-চৈ করে কুপের মধ্যে অনেক লোক ঢুকে পড়েছে। কেউ হিন্দী বলছিল, কেউ বাংলা। তবে দেখলাম, বাঙালীর সংখ্যাই বেশি। বুঝতে বিলম্ব হল না, গন্তব্যে এসে পৌঁছেছি। আমাকে কয়েকজন হাত ধরেই নামাবার উদ্যোগ করল।

আমি হেসে বললাম, 'আমি নিজেই নামছি। আপনারা মালপত্র-গুলো নামান।'

'কিছু ভাববেন না বিশ্বরূপদা।' কেউ চিৎকার করে উঠল, 'চক্রবর্তীজী, আপ না শোচিয়ে, মাল উল্ সব উতর যায়েগা।'

আমি কামরার বাইরে যেতে যেতে কবজির ঘড়ি দেখলাম। বেলা সাড়ে দশটা। এত বেলা হয়েছে, বুঝতে পারিনি। বাইরে এসে দেখলাম, মনোরমা ওর মাকে নিয়ে আগেই নেমেছে। ওর গলায়

একটা মালা। আমাকেও গলায় মালা পরিয়ে দিল একটি মেয়ে। নিচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। আমি সসংকোচে সরে গেলাম। তারপরেই চোখে পড়ল গুরুতুল্য বয়স্ক গায়ক মনোহর দেশপাণ্ডেকে। তাঁর গলায় মালা। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আশ্চর্য, কিছুই জানি না, আমরা একই গাড়িতে সবাই আসছি। দেশপাণ্ডেজী মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, হিন্দীতে বললেন, 'কেমন আছ বিশ্বরূপ ?'

বললাম, 'ভাল।'

তিনি আমার সাম্প্রতিক একটি লংপ্লেয়িং রেকর্ডে শোনা গানের খুব প্রশংসা করলেন। এই সময়ে এক ভদ্রলোক আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকান্তি, গায়ে পশমী পাঞ্জাবির ওপরে কাশ্মীরি চওড়াপাড় শাল। হাতে ছড়ি। তাঁতের ধুতি পরা। ভদ্রলোকের আরক্ত চোখ দুটো যেন অতিকায়। উচ্চ নাসা। মাথায় ছোট ছোট সাদা ধবধবে চুল, কিন্তু গোঁফজোড়ার রঙ ধূসর। সন্দেহ নেই, ভদ্র-লোকের চেহারা রীতিমত দৃষ্টি-আকর্ষণকারী। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের তারায় একটা কী ছিল, মনে হল, তিনি যেন আমার অন্তরের গভীরতর তল অবধি দেখতে পাচ্ছেন।

ভদ্রলোক অনায়াসে আমাকে প্রথমেই 'তুমি' সম্বোধন করে, বজ্রগম্ভীর কিন্তু পরিহাসের সুরে বাঙলায় বললেন, 'তুমি আমাকে কখনো দ্যাখনি, তবে নামটা বোধহয় শুনেছ।'

ভদ্রলোকের পাশ থেকে, চশমা-চোখে একটি যুবক বলে উঠল, 'উনি হচ্ছেন ত্রিপুরারি চ্যাটার্জি।'

ত্রিপুরারি চ্যাটার্জি! নামটা শোনা-মাত্রই ওস্তাদজীর গলার স্বর যেন আমি শুনতে পেলাম, 'ত্রিপুর হচ্ছে আমার ছেলেবেলার দোস্ত। অলখিয়া প্রকাশজীর আমরা দুজনে শিষ্য ছিলাম। কিন্তু ত্রিপুর বেশি দিন গান শেখেনি। তবে ও যদি গান শিখত, অলখিয়াজীর সব থেকে সেরা সাকরেদ হতে পারত।'

আমি তৎক্ষণাৎ নিচু হয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললাম, 'ওহ্, আপনি! আপনার কথা ওস্তাদজী প্রায়ই বলতেন।'

ত্রিপুরারিবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বলবে বৈ কি, ব্যাটা আমাকে চিরটা কাল জ্বালিয়েছে। যাক, সে-সব কথা পরে হবে। তুমি আমার সঙ্গে যাবে, আমার বাড়িতেই উঠবে।'

সঙ্গীত-সম্মেলনের কয়েকজন হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন। একজন বললেন, 'কাকাবাবু, সব শিল্পীদের জন্যই আমরা রবীন্দ্র-ভবনের গেস্ট হাউসে থাকবার ব্যবস্থা করেছি।'

ত্রিপুরারি গম্ভীর স্বরে বললেন, 'জানি। আরো তো শিল্পীরা রয়েছেন, তাঁদের সেখানে রাখ। নাসিরার শিষ্য আমার বাড়িতেই থাকবে।'

ত্রিপুরারি চট্টোপাধ্যায়ের বজ্রগম্ভীর স্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ও আদেশের সুর ছিল, সহসা কেউ প্রতিবাদ করতে পারলেন না। তিনি আবার উদ্যোক্তাদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা বরং বিশ্বরূপের মাল-পত্র যন্ত্রপাতি সব আমার গাড়িতে তুলে দাও। আমি ঠিক সময়ে ওকে নিয়ে হাজির হব। এসো বিশ্বরূপ।'

আমি উদ্যোক্তাদের দিকে অসহায় জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। তাঁরা সেইভাবেই আমার দিকে তাকালেন। বোঝা গেল, ত্রিপুরারি চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার সাহস এখানে কারোরই নেই। সবাই তাঁর আদেশ পালন করে, ছুটোছুটি করে, আমার স্যুটকেস হারমোনিয়ম তানপুরা স্টেশনের বাইরে নিয়ে চলে গেল। সেই ফাঁকেই আমাকে স্বয়ং ত্রিপুরারি চট্টোপাধ্যায়, সম্মেলনের সভাপতি সম্পাদক এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

যথাবিহিত পরিচয়াদির পরে, ত্রিপুরারি চট্টোপাধ্যায় আমাকে ব্যস্তভাবে ডাকলেন, 'এসো হে বিশ্বরূপ, আর দেরি নয়।'

এই সময়ে, কে যেন আমার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলে উঠল, 'ত্রিপুরারি চাটুজ্যের ভূতের বাড়িতে যাবেন না। উনি কিন্তু

ছদ্মবেশী কাপালিক !'

আমি অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাবার আগেই, একজন মধ্যবয়স্ক লোক আমার পাশ থেকে সরে গেলেন। যাবার আগে, একবার আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যেন কিছু ইশারা করলেন। আমি 'ছদ্মবেশী কাপালিক' কথাটার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম না, কিন্তু মনের কোথায় যেন কেমন খচ্ খচ্ করতে লাগল। আমি ত্রিপুরারি চ্যাটার্জির সঙ্গে যেতে যেতে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি সামনের দিকে তাকিয়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর হাতের ছড়িটা নিতান্তই শৌখীন, তার ওপর ভর দিয়ে তিনি চলছেন না। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন একজন যুবকের মতই তর তর করে, যার অর্থ তাঁর হৃদ্‌যন্ত্রটি এখনো বেশ শক্ত-পোক্ত আছে। রক্ত-চাপও এ বয়সে নিশ্চয়ই স্বাভাবিক রেখেছেন, অন্যথায় ওঁর বয়সের ব্যক্তির পক্ষে এভাবে সিঁড়ি ওঠা সম্ভব না। কিন্তু কাপালিকের অর্থ কী ? আমার তো কাপালিকের অভিজ্ঞতা একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' থেকে। উনি কি আমাকে বলি দেবেন নাকি ?

কথাটা চিন্তা করেও হাসি পেল। আর যাই হোক, এরকম একটা আজগুবি চিন্তা আমি মনে স্থান দিতে পারি না। ওভারব্রিজ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ত্রিপুরারি বললেন, 'তুমি আসছ শুনে, আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম, তোমাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব। তোমার কেমন লাগবে জানি না। আমাদের বাড়িটা শহরের বাইরে। এ অঞ্চলে আমাদের বাড়িকে সবাই মহা মাতঙ্গীর বাড়ি বলে জানে। অবাঙালীরা বলে, মহা মাতঙ্গী মাঈ থান।'

মাতঙ্গী! আমি অবাক অনুসন্ধিৎসায় জিজ্ঞেস করলাম, 'মহা মাতঙ্গী কি কোন দেবী ?'

'হ্যাঁ।' ত্রিপুরারি ওভারব্রিজের শেষে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন, 'সচরাচর এরকম নাম কোথাও বিশেষ শোনা যায় না। দুর্গা কালী চণ্ডী, এইসব শোনা যায়। কিন্তু আমাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন

মাতঙ্গী। তিনি শক্তিরই আর এক রূপ। এখনও প্রতি শনি-মঙ্গল-বারই বলি হয়। আজ শনিবার, আজও বলি আছে।'

বলি! ছদ্মবেশী কাপালিক কথাটা আমার আবার মনে পড়ে গেল। এবং মনে মনে হাসিও পেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দেবীর কোন বিগ্রহ আছে?'

'নিশ্চয়!' ত্রিপুরারি হাসলেন, 'বিগ্রহ সব শক্তিরই আছে, যেমন থেকে থাকে। তবে ইনি মত্ত হস্তীবাহিনী, যা সচরাচর দেখা যায় না। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে এই দেবীকে আমাদের এক পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল একটি দীঘি খুঁড়তে গিয়ে।'

কথা আর বেশি এগোল না। আমরা স্টেশনের বাইরে এলাম। গোটা কয়েক প্রাইভেট মোটরকার, ট্যাক্সি আর অসংখ্য সাইকেল-রিকশা বাইরে সারবন্দী দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম উদ্যোক্তাদের যারা আমার মাল-পত্র নিয়ে এসেছিল, তারা একটা পুরনো শেভ্রলেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যে-মেয়েটি আমার গলায় মালা দিয়েছিল, সে-ও কৌতূহলিত উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, সেখানে দাঁড়িয়েছিল। শেভ্রলেট গাড়িটি পুরনো হলেও, চেহারাটি ঝকঝকে ছিল। কিন্তু এসব গাড়ি তো তেল খাওয়ার যম! শহরের ধনীরাও আজকাল আর এসব গাড়ি রাখেন না।

ত্রিপুরারি সেই গাড়িটির সামনেই এগিয়ে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশ্বরূপের সব জিনিসপত্র তুলে দিয়েছ?'

প্রায় ভোজপুরি চেহারার মত, বিশাল গুঁপো দশাশয়ী চেহারার, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি লোক দরজা খুলে অপেক্ষমাণ ছিল। সে হিন্দীতে বলল, 'শামাম সবই তুলে নেওয়া হয়েছে।'

আমি দেখে খুব খুশি হলাম, আমার দুটো তানপুরাই গাড়ির সামনের আসনে, হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। এমন অভিজ্ঞতাও আমার আছে, তানপুরা অনেকে গাড়ির পিছনের কেরিয়ারে তুলে দেয়, যা আমাকে

আবার নামিয়ে নিতে হয়। এখানে দেখছি, সেই ভুলটি কেউ করেনি। আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। ওর চোখে যেন উদ্বেগ, ঠোঁটের কোণে হাসি। বলল, 'আপনি ওবেলা তাড়াতাড়ি চলে আসবেন।'

'কেন?' ত্রিপুরারি তৎক্ষণাৎ মেয়েটির দিকে ফিরে তাকালেন, 'বিশ্বরূপের প্রোগ্রাম তো রাখা হয়েছে রাত্রি একটা থেকে। ওবেলা তাড়াতাড়ি এসে কী করবে? তোমার নাম কী? কাদের বাড়ির মেয়ে তুমি? তোমার বাবার নাম কী?'

মেয়েটি যেন সঙ্কোচে ও উৎকণ্ঠায় এতটুকু হয়ে গেল। মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, 'আমি রাজেন্দ্রপ্রসাদ রোডে থাকি। বাবার নাম হিরণ্ময় রায়।'

ত্রিপুরারি মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'ওহ্, তুমি হিরণের মেয়ে? আমাদের উকীল হিরণ তো?'

মেয়েটি যেন কিঞ্চিৎ ভরসা পেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার নাম বিদিশা।'

'বি—দি—শা!' ত্রিপুরারি হেসে উঠলেন, 'মানে কি, দিশাহারা, না সেই জায়গাটার নামে নাম?'

বিদিশার মুখ আরো লাল হয়ে উঠল, মুখ নত করল। ত্রিপুরারি তার মাথায় হাত স্পর্শ করে বললেন, 'আরে বেটি লজ্জা পাচ্ছিস কেন? আমি ঠাট্টা করে বললাম। ভয় নেই, বিশ্বরূপকে নিয়ে আমি ঠিক সময় মত চলে আসব।'

উদ্যোক্তাদের একজন অবাক স্বরে বলে উঠল, 'আপনি আসবেন?'

'তা আসব বই কি। নাসিরার সাকরেদ গাইবে, আমি শুনব না?' ত্রিপুরারি হাসলেন, দাঁতগুলো তাঁর নিঃসন্দেহে বাঁধানো, যদিও বাঁধানো দাঁতের মত ধবধবে সাদা না, রীতিমত ছোপ লাগা। আমাকে গাড়ির পিছনের খোলা দরজার মধ্যে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'চলো চলো, এখানে আর দেরি নয়। অম্বর বেটা, গাড়ি হাঁকাও।' বলে তিনিও আমার সঙ্গে ঢুকে পিছনের আসনে বসলেন, দরজা বন্ধ করে দিলেন।

ভোজপুরি গোছের লোকটি চালকের আসনে বসে, প্রথমেই তানপুরা

ডুটির উঁচু ভাগ নিজের কোলে শুইয়ে নিল। তারপরে গাড়ি স্টার্ট করল। ঘিঞ্জি শহরের মধ্য দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। ত্রিপুরারি আবার মুখ খুললেন, 'নাসিরাটা যে আমার আগে চলে যাবে, কখনো ভাবিনি। খালি পেটে মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটাকে ব্যাটা পচিয়ে ফেলেছিল।'

কথাটা একেবারে মিথ্যা না, অতএব আমার প্রতিবাদ করারও কিছু ছিল না।

তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'নাসিরা আমার কথা তোমাকে কী বলেছে ?'

বললাম, 'আপনারা দুজনেই অল্‌খিয়া প্রকাশজীর শিষ্য ছিলেন।'

'আর কারোর নাম করে নি ?'

আমি মনে করতে পারলাম না, বললাম, 'মনে পড়ছে না। কে বলুন তো ?'

'কোন মেয়ের নাম করেনি ?'

'না তো।'

'তাহলে আমিও আর বলতে চাই না।' ত্রিপুরারি বললেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি গান ছেড়ে দিয়েছিলেন কেন ?'

'সে অনেক ব্যাপার বাবা।' ত্রিপুরারি বললেন, 'ছেড়ে কি আর দেওয়া যায় ? এখনো তানপুরা নিয়ে বসি, একটু-আধটু চর্চা করি। তবে নাসিরার মত গান নিয়ে থাকতে পারিনি। নাসিরা চলে যাবার পরে, আমি একটু অন্য পথে চলে গেছলাম। বলতে পার, মাতঙ্গীর সাধনায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরে হয়ে গেলাম, না-ঘরকা, না-ঘাটকা। তুমি কংসারি চাটুজ্যের নাম শুনেছ ?'

আমার মনে পড়ে গেল, কংসারি চট্টোপাধ্যায় বিখ্যাত বাঁশিবাদক ছিলেন। বললাম, 'তাঁকে চোখে দেখিনি কখনো, নাম তো নিশ্চয়ই শুনেছি। তাঁর চমৎকার বাঁশি রিসেণ্টলি শুনেছি লংপ্লেয়িং-এ।'

'কংসারি চাটুজ্যে ছিলেন আমার বাবা।' ত্রিপুরারি বললেন, 'আমি তাঁর একমাত্র ছেলে। আমার আর কোন ভাই-বোন নেই, হয়ওনি।

তাঁকে আমার ভাল মনেও নেই। আমার ছেলেবেলাতেই উনি মারা যান। শুনেছি, কবিরাজ-হাকিমরা ওঁকে বাঁশি বাজাতে বারণ করেছিলেন। উনি শোনেননি। অবিশ্যি মাতঙ্গী বাড়ির কোন্ পুরুষই বা কী কথা শুনেছে? আমিও শুনিনি। আমার মা কোনটাই চাননি। গান নয়, মাতঙ্গীর সাধনাও নয়। বিষয়-আশয় নিয়ে থাকব, এই চেয়েছিলেন। যাক, এসব কথা বলার কোন মানে হচ্ছে না। তুমি নাসিরার জন্মভিটাটা কাল একবার দেখে আসবে নাকি?'

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। অল্‌খিয়া প্রকাশজী কোথায় ছিলেন? তাঁর দেশ কোথায়?'

'তাঁর দেশ এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে। তবে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে এসে থাকতেন।'

আমি অবাক হলাম, কারণ ওস্তাদজীর কাছে একথাটা শুনিনি। বললাম, 'তাই নাকি?'

ত্রিপুরারি বললেন, 'হ্যাঁ, আসলে তিনি তো ছিলেন একজন সাধক। সাধনার নাম অলখ্ নিরঞ্জন। সেই অলখ্ থেকেই অল্‌খিয়া। এর মধ্যে দেহতত্ত্ব আছে। তবে তিনি আমাদের মাতঙ্গীর প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি পোষণ করতেন, কিন্তু বলিদানটা কখনো পছন্দ করতেন না। আমি আর নাসিরা, আমাদের বাড়িতে একসঙ্গে তাঁর কাছে বসে গান শিখেছি।'

আমার সহসা মনে পড়ে গেল, একটু আগেই তিনি কোন মেয়ের কথা বলছিলেন, যিনি অল্‌খিয়া প্রকাশজীর কাছে সম্ভবতঃ গান শিখতেন। কিন্তু যেহেতু আমার ওস্তাদজী আমাকে কিছু বলে যাননি, সেই হেতু তিনিও আর বলতে চান না। অতএব আমার জিজ্ঞাসা করাটা অশোভন। কিন্তু আমার কৌতূহল, এই মুহূর্তে অতি মাত্রায় বেড়ে উঠল। সেই মেয়ে—অর্থাৎ মহিলাও কি মাতঙ্গী বাড়িতে, এঁদের সঙ্গেই গান শিখতেন?

আমার মনের জিজ্ঞাসা মনেই থেকে গেল। দেখলাম গাড়ি শহর ছাড়িয়ে, ক্রমে উঁচু দিকে উঠছে। বাঁ দিকে একটি ছোট পাহাড়। রাস্তাটা তার ধার ঘেঁষে ওপরের দিকে উঠছে। ডান দিকে তেমন ঘন না হলেও বড় বড় গাছপালার নিবিড় ছায়া। গাছগুলো উত্তর-পশ্চিমা বাতাসে ঝাপটা খাচ্ছে, ধুলো উড়ছে। গাড়ির কাঁচ বন্ধ না থাকলে, এই বাতাস হাড় কাঁপিয়ে দিত।

গাড়ি উঁচুতে উঠতে উঠতে, বাঁ দিকের পাহাড়ের শীর্ষদেশ ছুঁয়ে ফেলল, আর সহসাই বিশাল এক সমতল ভূমির ওপরে এসে পড়লাম। ভূমি বলতে বিশাল মাঠ, মাঠের এক প্রান্তে প্রাচীন অট্টালিকা। দোতলা বিরাট প্রাচীন প্রাসাদের আর এক পাশে, একতলা ঘরের লম্বা সারি। বাঁ দিকেও সেই রকম একসারি ঘর। মাঝখানের মাঠটা যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠের মতই বিশাল। জানি না, কোন এক কালে এ মাঠ বাগান ছিল কী না, এখনো এখানে-সেখানে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটা গাছ। সম্ভবতঃ আমগাছ।

আমি যদি দিক ভুল না করে থাকি, প্রাচীন প্রাসাদটি মাঠের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। পূর্বে ও পশ্চিমে সুদীর্ঘ ঘরের সারি। টানা লম্বা একতলা বাড়িগুলোকে দেখলে মনে হয়, যেন শতাধিক ঘর সেখানে আছে। উত্তর আর পূর্ব প্রান্তের কোণাকুণি আকাশে, অনেকটা উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরের মত চূড়া জেগে আছে। গাড়ি মাঠের ওপর কাঁকর বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে উত্তর দিকেই এগিয়ে গেল। ত্রিপুরারি বললেন, 'আমরা এসে গেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে, সামনে রাজবাড়ি।'

'ওটা আমাদের বাড়ি।' ত্রিপুরারিও হেসে বললেন, 'আমরা কোনকালে রাজা ছিলাম না। আমাদের বাড়িটাও মাতঙ্গী বাড়ি বলেই পরিচিত। স্থানীয় লোকেরা বলে, ঠাকুর মোকাম। তুমি যদি দশ-বিশ মাইলের মধ্যে কিংবা তারো বেশি দূরের স্থানীয় লোককে বল, তুমি মাতঙ্গী যাবে, তাহলে তোমাকে এখানেই তারা পাঠিয়ে দেবে।'

গাড়ি প্রাচীন প্রাসাদের গেটের সামনে দাঁড়াল। গেট এত বড় না যে, তার ভিতর দিয়ে গাড়ি ঢুকতে পারে। কলকাতার আশেপাশে প্রাচীন বড় বড় বাড়িগুলোর যেমন দু পাশে বাইরে ঘর থাকে, মাঝখানে ভারি কাঠের পাল্লার বড় দেউড়ি থাকে, এখানকার চেহারাও সেইরকম। ধুলো উড়িয়ে সেই দেউড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই, ভিতর থেকে দু-তিনজন লোক ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এল। মনে হল, দেউড়ি দিয়ে ঢুকে, দু পাশের ঘরেই তারা ছিল। মাঝখানের জায়গাটি ছায়ায় ভরা ঠাণ্ডা।

ত্রিপুরারি ডাকলেন, 'এসো।'

তিনি দরজা খুলে নামলেন, আমি তাঁর পিছনে পিছনে নামলাম। অম্বর গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করে, ডান পাশের দরজা খুলে, খুব সাবধানে তানপুরা দুটি কোনরকম ঠোকাঠুকি না লাগিয়ে বের করল। ত্রিপুরারি একটি লোককে হিন্দীতে হুকুম দিলেন, 'রঘু, তুমি তানপুরা দুটো নিয়ে, পুব তরফের ওপর ঘরে যেখানে সাহেবের থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেই ঘরের গোল টেবিলের ওপর নিয়ে রাখ। পরে এসে হারমোনিয়ামের কাঠের বাক্স আর স্যুটকেশ নিয়ে যাবে।'

'জী।' রঘু তার আপন কাজে ব্যস্ত হল।

ত্রিপুরারি আর একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গরম পানি, গোসলখানা উনা সব সাফা করা আছে তো?'

একটি লোক এগিয়ে বলল, 'জী।'

'তুমি ওপরে চলে যাও। তেওয়ারিকে বল আগে চা বানাতে।'

'জী।' লোকটি চলে গেল।

আর একজন দাঁড়িয়েছিলেন, নিরীহ মধ্যবয়স্ক বাঙালীর মত দেখতে।

ত্রিপুরারি তাঁকে বললেন, 'এর নাম বিশ্বরূপ চক্রবর্তী, নাসিরুদ্দিনের শিষ্য। পানপাতিয়াকে দিয়ে পশ্চিম মহলে খবরটা পাঠিয়ে দিন।'

ভদ্রলোক শশব্যস্তে অমায়িকভাবে আমাকে হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমিও নমস্কার জানালাম, কিন্তু ভদ্রলোকের কোন পরিচয় পেলাম না। ত্রিপুরারি আমাকে ডাকলেন, 'এসো বিশ্বরূপ, ভেতরে

যাওয়া যাক। আগে একটু চা খেয়ে, চান-টান করে নেবে তো?'

আমি ওঁকে অনুসরণ করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আগে স্নান-টান-গুলো সেরে নিতে চাই।'

সামনের উঠোনে একসারি একতলা ঘর। বেশির ভাগ ঘরের দরজাই বন্ধ। একটা ঘরের দরজা খোলা। দেখলাম, সেখানে কয়েক-জন লোক কোন কাজে ব্যস্ত থাকলেও, আমাকে কৌতূহলিত চোখে দেখছিল। ত্রিপুরারি ছড়ি ঠুকে বাঁ দিকের আর একটি দেউড়ির ভিতরে ঢুকলেন। সেই নিরীহ ভদ্রলোকটি তার আগেই সেই দেউড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকে গিয়েছেন।

দেউড়ির ভিতরে ঢুকে, সামনে চক-মেলানো বাঁধানো বিরাট উঠোন। ডান দিকে একতলা সারি সারি কয়েকটা ঘর। এবং থামওয়ালা বারান্দা। ঘরগুলো পুব দিকে। উত্তরে আর পশ্চিমেও একরকম বারান্দা আর থাম। আমি ত্রিপুরারিকে অনুসরণ করবার মুহূর্তে, একবার উত্তর ও পশ্চিমের দোতলার দিকে তাকালাম। ওপরতলায়ও থাম-ওয়ালা বারান্দা, কিন্তু দুই থামের অন্তর্বর্তী গোলাকার খিলান, চিক দিয়ে ঢাকা। চিক ঢাকা দেখেই, আমার মনে প্রথম ত্রিপুরারির অন্দর-মহল ও তার অধিবাসীদের বিষয়ে একটা কৌতূহল জাগল, যার নিরসন আপাতত একান্তই অসম্ভব।

পুবদিকের বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখলাম, বারান্দার ওপরেই কয়েকটি আরামকেদারা দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে। দুটি দরজা খোলা ঘরের মধ্যে, সাবেক কালের আসবাব দিয়ে সাজানো বৈঠকখানার মত। পায়রার বক্ বকম্ চারদিকে, এবং পাখার ঝাপটায় আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এই শ্যাওলা ধরা বিবর্ণ বিরাট প্রাসাদের থামে ও দেওয়ালে আঘাত করে যেন একটা শাসানির মত শব্দ করছে। সে-শব্দ কখনো দমকা নিশ্বাসের মত।

ত্রিপুরারি সোজা এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ফিরলেন। ডান দিকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু কাঠের সিঁড়ি, বিবর্ণ মোটা লাল চট

দিয়ে মোড়া। কাঠের সিঁড়ির প্রচলনটা সাবেক কালের সাহেব-বাড়িতেই দেখা যায়। সাড়ে তিনশো বছরের মাতঙ্গী বাড়িতে, এরকম ব্যবস্থা কেন? ত্রিপুরারি আমাকে ডাকলেন, 'এসো বিশ্বরূপ!'

আমি ওঁকে অনুসরণ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের এ বাড়ির বয়স কত?'

'তা হবে দেড়শো বছর।' ত্রিপুরারি সিঁড়ির বাঁ দিকে মোড় নিতে নিতে বললেন।

বাঁক নেবার মুখেই, আমার দৃষ্টি চলে গেল একতলার পশ্চিম প্রান্তে। সেই প্রান্তেও একই রকম কাঠের সিঁড়ি রয়েছে। বোঝা গেল, দোতলার পূর্ব ও পশ্চিম মহলে যাবার আলাদা সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ি কেন, সে জবাবও পেয়ে গেলাম। দেড়শো বছর আগের দেশীয় ধনী ব্যক্তিরাও সাহেবদের অনুকরণে বাড়ি করতেন, কাঠের সিঁড়ি করতেন। বাইরে থেকে এই মাতঙ্গী বাড়িটিকে আমার অনেকটা কেল্লার মত মনে হয়েছিল।

বেশ উঁচু সিঁড়ি। দোতলায় উঠলাম পশ্চিম দিকে মুখ করে। সেদিকের সিঁড়ি দেখতে পেলাম না। বারান্দার মাঝামাঝি কিংবা কিছুটা পুবে এগিয়েই রয়েছে একটি চৈনিক কাঠের পার্টিশন। তাছাড়া চিক ঢাকা থাকার জন্য কিছুটা অন্ধকারও। ত্রিপুরারি আবার পুবদিকে এগিয়ে গেলেন। সামনেই বড় দরজাওয়ালা ঘর। বাঁ পাশেও ঘরের দরজা আছে, তা বন্ধ। আমি তাঁকে অনুসরণ করে সেই ঘরে গেলাম। ঘরের শেষে, পুবদিকে আর একটি দরজা। ত্রিপুরারির সঙ্গে আমি সেই ঘরে গেলাম।

ঘরটির মাঝখানে ডিম্বাকৃতি পাথরের টেবিল। তাকে ঘিরে সাবেক কালের, গদী-আঁটা চেয়ার কয়েকটি। অন্যদিকে প্রায় হাল আমলের বড় সোফা। পুব দিকে রেলিং ঘেরা বারান্দা। ঘরটির ডাইনে বাঁয়ে ছুটি দরজা, ছুটি আলাদা ঘর। ত্রিপুরারি বাঁ দিকের ঘরে ঢুকে আমাকে ডেকে বললেন, 'তুমি এ ঘরে থাকবে।'

আমি সেই ঘরে যেতে উদ্যত হতেই, ডান দিকের ঘর থেকে একটি রমণীমূর্তি নতমুখে দ্রুত বেরিয়ে এল, এবং আমাদের প্রবেশপথ দিয়ে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রমণীর শাড়ি পরা মূর্তি আমাকে এতই চমকিয়ে দিল, আমি ভূত দেখার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমি কি আনিসা বেগমকে দেখলাম? কিন্তু তা-ই বা কী করে সম্ভব? আমি যাকে দেখলাম, তার বয়স আনিসা বেগমের থেকে অনেক কম, অথচ যেন অবিকল সেই মুখ।

'কই হে বিশ্বরূপ, এ ঘরে এসো।' ত্রিপুরারির ডাক ভেসে এল।

আমি তাড়াতাড়ি বাঁ দিকের ঘরে গেলাম। প্রায় একরকম ঘর, একটু ছোট। পরিচ্ছন্ন গদী-আঁটা শোবার বিরাট খাট। অন্যদিকে মেঝের ওপর গদী পাতা, গোটা কয়েক তাকিয়া। তার ওপরেই রয়েছে আমার তানপুরা। এ ঘরের পূবদিকেও দরজা রয়েছে এবং রেলিং ঘেরা বারান্দা। ত্রিপুরারি ঘরের উত্তর দিকের দেওয়ালে একটি দরজা খুলে বললেন, 'এটা স্নানের ঘর। একবার দেখে নাও।'

আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতই ত্রিপুরারিকে অনুসরণ করে, স্নানের ঘর দেখলাম। শোবার ঘরের থেকে স্নানের ঘরটি খুব ছোট না। বেসিন কমোড বাথ-টাব, সবই রয়েছে। খুব নতুন না, খুব পুরনোও না। বেসিনের ওপর একটি আয়না রয়েছে। ত্রিপুরারি বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'ও পাশেও এরকমই একটা ঘর রয়েছে। অ্যাটাচড বাথরুম—সবই এইরকম। বিছানা গদী ড্রেসিংটেবিল— !'

আমি ইচ্ছা করেই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ এসো, একবার দেখে নেবে। তারপরে তোমার যে-ঘরে ইচ্ছা থেকো।'

মাঝখানের ঘরটির দু'পাশে উত্তরে দক্ষিণে দুটি ঘর। আমি উত্তরের ঘরে ঢুকেছিলাম। দক্ষিণের ঘর থেকে সেই রমণীকে বেরোতে দেখেছি,

সেই কারণেই ঘরটি দেখার কৌতূহল রোধ করতে পারলাম না। কিন্তু কোন তফাতই নেই। খাট, খাটের পরিচ্ছন্ন বিছানা, মেঝেও গদী তাকিয়া, ড্রেসিংটেবিল, গোটা তুই চেয়ার ও একটি ছোট টেবিল এক কোণে। এ ঘরের দক্ষিণের জানলা তুটি যেমন বন্ধ, ও ঘরের উত্তরের জানলা তুটিও তেমনি বন্ধ। দেওয়াল-আলমারি এ ঘরেও আছে, ও ঘরেও রয়েছে, এবং একই রকম স্নানের ঘর। কিন্তু আমার তানপুরা রাখা হয়েছে উত্তরের ঘরে। অনুমিত হয়, গৃহকর্তা তাঁর ভৃত্যদের সেইরকম নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় তানপুরা সেই ঘরে কেন রাখা হয়েছে? স্যুটকেশটা অবিশ্যি চোখে পড়েনি। আমি বললাম, 'আমার কাছে সব ঘরই সমান। এ সব ঘরে আর কেউ থাকেন না?'

ত্রিপুরারি মাঝের বড় ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'কে থাকবে বল, আছে কে? আমি আর আমার স্ত্রী। আমার এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলেও বিয়ে করেছে, ও নিজের বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বম্বেতে থাকে, চাকরি করে। আমি মন্দির-বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় থাকি। তোমাদের মত কেউ এলে, এসব ঘরে থাকবার ব্যবস্থা হয়। তবে নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। তা নইলে চামচিকে উড়ত তোমাকে ঘিরে, ঘরের গন্ধ অন্যরকম হত।'

ত্রিপুরারি হাসলেন। এই সময়ে চায়ের ট্রে হাতে একটি লোক এল। কপালে চন্দনের ফোঁটা, মাথায় টিকি, গায়ে সামান্য একটি ফতুয়ার মত জামা। ত্রিপুরারি হিন্দীতে বললেন, 'এই যে মিশির, এই ঘরের বড় টেবিলের ওপরই চা রাখ।'

মাঝের বড় ঘরের ডিম্বাকৃতি মার্বেল পাথরের টেবিলের ওপরে, মিশির চায়ের ট্রে রাখল। টি পট, তুটি কাপ-ডিশ। একটি বড় ডিশে কিছু বিস্কুট। মিশির আমাকে কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করে, ত্রিপুরারিকে হিন্দীতে বলল, 'বাবুজীর স্নান হয়ে গেলে, নাস্তা নিয়ে আসব।'

আমি বললাম, 'এত বেলায় আর প্রাতরাশের দরকার হবে না। স্নানের পরে, আমি একবারে দুপুরের খাওয়া সেরে নেব।'

ত্রিপুরারি বললেন, 'তোমার রোজকার নিয়মমত যা করবার করবে। এস, এখন একটু চা খাওয়া যাক। মিশির, তুমি যাও, দরকার হলে আমি খবর পাঠাব।'

মিশির যাবার আগে বলে গেল, 'রঘু গরম জল নিয়ে আসছে। আমি চা ঢেলে দেব?'

'কোন দরকার নেই।' ত্রিপুরারি তাঁর ছড়িটি টেবিলের ওপর রেখে, একটা চেয়ারে বসে, টি-পট থেকে নিজেই দুটো কাপে চা ঢাললেন।

মিশির চলে গেল। আমার চোখের সামনে ভাসছে সেই মুখ! ত্রিপুরারির পাশাপাশি চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে ভাবলাম, ত্রিপুরারির আপন বলতে তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ থাকেন না। বাকি সবই সম্ভবতঃ ঠাকুর চাকর ঝি। কিন্তু আমি যে-রমণীকে দেখেছি, তার বয়স তিরিশ হতে পারে। যদি অবিকল আনিসা বেগমের মত সেই রমণীর মুখের আদল না হত, তা হলে তাকে আমি ত্রিপুরারির কন্যা বলেই ভাবতাম। তাঁর স্ত্রী হিসাবে সেই রমণীকে ভাবা অসম্ভব! অথচ ত্রিপুরারি বললেন, তিনি আর তাঁর স্ত্রী ছাড়া এ বাড়িতে আর কেউ নেই। তাঁর প্রথম স্ত্রীর কি মৃত্যু ঘটেছে? আমি যে-রমণীকে একটু আগে দেখলাম, তিনি কি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী? তা হলেও আমার বিস্মিত হবার কিছু ছিল না। বিস্ময় আমার সীমাহীন একটি প্রশ্নেই, আনিসা বেগমের মত অবিকল মুখ এখানে কী করে এল?

'মনে হচ্ছে, তুমি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছ?' ত্রিপুরারি গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে, ব্যস্তভাবে বললাম, 'না না, চিন্তার কী আছে?'

'তা তো জানি না।' ত্রিপুরারি বললেন, 'হঠাৎ কেমন চুপচাপ হয়ে গেলে, মনে হল। তাই জিজ্ঞেস করছি।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'কিছুই না।' কথাটা বলেই মনে হল রমণীর কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু সদ্য-আগন্তুক অতিথি আমি, গৃহের কোন রমণীর বিষয়ে এই কৌতূহল প্রকাশ করা অশোভনতা। চেষ্টা করলাম, আপাতত সেই মুখের বিষয় মনের গোপন গহ্বরে চাপা দিতে। চুপচাপ থাকার একটা যুক্তি হিসাবে বললাম, 'ওস্তাদজী আর আপনি এই বাড়িতে অলখিয়া প্রকাশজীর কাছে গান শিখতেন, এটা আমার কাছে একটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার। আমি আপনার কাছে, আপনাদের পুরনো দিনের কথা শুনতে চাই।'

'শোনাব, অনেক কথাই তোমাকে শোনাব।' ত্রিপুরারির স্বরে যেন কেমন রহস্য ঢেউ দিয়ে উঠল, বললেন, 'আমি কি আর তোমাকে এমনি এমনি আমার বাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছি। তুমি নাসিরার চ্যালা বলেই ধরে নিয়ে এসেছি। আমি তোমাকে শোনাব, তোমার কাছ থেকেও আমি অনেক কথা শুনব!'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আমার কাছ থেকে আপনি শুনবেন ওস্তাদজীর কথা?'

'নিশ্চয়!' ত্রিপুরারি বললেন, 'ওর সঙ্গে শেষের দিকে বেশ কয়েক বছর প্রায় যোগাযোগ ছিলই না। ওর শেষ জীবনের দিনগুলোর কথা তোমার কাছ থেকে শুনব। আর তোমাকে আমার একটা অনুরোধ আছে।'

আমি জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর দিকে তাকালাম। ত্রিপুরারি বললেন, 'আমি জানি, এই শীতকালটা বিশেষ করে, কলকাতা বম্বেতে, তোমার মত শিল্পীর ঠাসা প্রোগ্রাম থাকার কথা। শুনেছি, তুমি নাকি আগামী-কাল সন্ধ্যের ট্রেনেই কলকাতা ফিরে যাবে। আমার অনুরোধ, আরো দু-একটা দিন থেকে যাও। আমার অতিথি হিসাবে।'

ত্রিপুরারির আগ্রহে আমি যেন ঠিক স্বস্তি বোধ করছি না। মন থেকে যতই উড়িয়ে দিই, স্টেশনের সেই ফিস ফিস কথা আমার কানে বেজেই চলেছে। তার পরে আর এক রহস্য, সেই রমণীর মুখ! অবিকল

আনিসা বেগমের মুখ, যদিও বয়সে কিছু তরুণ। যদিও আমার কৌতূহল অগাধ এই বাড়ির বিষয়ে। কারণ এখানে আমার ওস্তাদজী অল্‌খিয়া প্রকাশজীর কাছে সাধনা করতেন।

ত্রিপুরারি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আরে এত কী ভাবছ হে বিশ্বরূপ! দু-একটা দিন আমার অতিথি হয়ে থাকলে, তোমার ক্ষতি হবে না।'

আমি বললাম, 'যাঁরা আমাকে এখানে এনেছেন, তাঁরা আগামী-কালই কলকাতায় ফেরার টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে ফেলেছেন। অন্ততঃ সেইরকমই কথা আছে। আমি তখন আপনার কথা তো জানতাম না।'

'জানতে, খেয়াল করোনি যে, তোমার গুরুভাইয়ের জায়গায় আসছ।' ত্রিপুরারি যেন বেশ জোর দিয়েই বললেন, 'আর টিকিট, রিজার্ভেশনের কথা আমাকে শুনিও না। এসব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার ওস্তাদজীর জন্ম-ভিটেয় কালই তোমাকে নিয়ে যাব। নিজের ওস্তাদজীর বিষয়ে তোমার পুরনো কথা জানতে ইচ্ছে করে না? তা ছাড়া, তোমাকে আমি গান শোনাব। অল্‌খিয়ার ঘরানারই গান, তুমিও গাও, তোমাকে আমি শোনাব।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি এখনো চর্চা করেন?'

'আমি তো বলিনি আমার গানই তোমাকে শোনাব।' ত্রিপুরারি বললেন, 'অল্‌খিয়া ঘরানার গান তোমাকে আমি শোনাব। মোটের ওপর, তুমি আমার গুরুভাইয়ের চ্যালা, আমি নিজে তোমার বিশেষ গুণমুগ্ধ। তোমাকে আমার কাছে দু-একটা দিন থেকে যেতে হবে। এবার তুমি চানটান যা করবার কর, আমি চলি। দুপুরে খেয়ে কি ঘুমবার অভ্যেস আছে নাকি?'

বললাম, 'একেবারেই না। আপনি আমার ওস্তাদজীকে জানতেন। আমার খাওয়া ঘুমনোর অভ্যাসটা তাঁর মতই।'

ত্রিপুরারি হেসে বললেন, 'ওর খাওয়া বলতে তো সারা দিনে, কিছু কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা, শুকনো দু-একটা রুটি, এক-আধ টুকরো কাবাব দেখতাম। সে-সব অবিশ্যি অনেক আগের কথা। ঘুম তো প্রায় ছিলই না। প্রথম রাত্রে দু-তিন ঘণ্টা। ভোরবেলা তো রীতিমত রেওয়াজে বসত।'

'ধরে নিন, আমারও তাই।' আমি হেসে বললাম।

ত্রিপুরারি বললেন, 'আর মদ ?···আহা, লজ্জা পেও না। নাসিরা বরাবরই মদ খেতো না, পরে তো আরম্ভ করেছিল। তোমার যা দরকার, তা বলতে মোটেই লজ্জা করবে না। তুমি যদি এখনই কিছু চাও, আমি দিতে পারি। সব ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

উনি বলা সত্ত্বেও, সঙ্কোচবোধ না করে পারলাম না। বললাম, 'এখন আমার কোন দরকার নেই। সন্ধ্যেবেলা একটু হলেই হবে।'

'বুঝেছি। তারপরে একটু বিশ্রাম করে, তুমি গান গাইতে যাবে।' ত্রিপুরারি বললেন, 'ওস্তাদজীর উপযুক্ত চেলা হয়েছ দেখছি। নাসিরা কি শেষ দিকেও একই রকম ছিল ?'

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। মদ খেতে খেতে কখনো আসরে যেতেন না। তবে বাড়িতে কিংবা নিজের বিশেষ কোন জায়গায়—'

'বিশেষ কোন জায়গায় মানে কী ? আনিসার ঘরে ?' ত্রিপুরারি তাঁর অতি আয়ত ঈষৎ রক্তাভ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি চমকিয়ে উঠলাম, কেমন যেন থতিয়ে গেলাম, কোন জবাব দিতে পারলাম না। ত্রিপুরারির চোখের দিকে তাকালাম। আমার চোখে আবার ভেসে উঠল কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই মুখ। ইনি তা হলে আনিসা বেগমকেও চিনতেন ?

ত্রিপুরারি হঠাৎ অট্ট হেসে উঠে দাঁড়ালেন, ছড়িটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'আরে তুমি এত অবাক হচ্ছ কেন ?·ভুলে যেও না, আমি আর নাসিরা ছিলাম গুরুভাই। ওর কিছু কিছু কথা আমারও জানা আছে।'

আমি বললাম, 'আপনি তাহলে বেগম সাহেবাকে চিনতেন?'

'তা একটু-আধটু চিনতাম বই কি!' ত্রিপুরারি বললেন, 'আমি এখন চলি।'

এই মুহূর্তেই আমার জানতে ইচ্ছা হল, কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই রমণী কে? কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। ত্রিপুরারি বাইরে যাবার দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, 'আর তোমার দেরি করাব না, চানটান করে সুস্থ হও। হ্যাঁ, তোমার যা কিছু দরকার, রঘুকে বলবে। যদি একটু পান-টান করার ইচ্ছে হয়, তাও বলবে, সব ব্যবস্থা আছে। আর, তুমি চানের পরে যদি মা মাতঙ্গীর দর্শন চাও, রঘুকে বললে, ও সেখানে নিয়ে যাবে। আজ বলি আছে। আমি সেখানেই থাকব।'

ত্রিপুরারি চলে গেলেন। আমি আবার একটু চা ঢাললাম। পশ্চিমের খোলা দরজার দিকে তাকালাম। কাঠের পার্টিশনের স্তব্ধ আড়াল ও চিক-ঢাকা আবছায়া। ওদিকটায় পায়রাদের ভিড় নেই। যদিও বক্-বকম্ ডাক ভেসে আসছে সর্বদাই। কিন্তু বলি দেখতে যাওয়ার তেমন ইচ্ছা আমার নেই। বলি আর রক্ত ইত্যাদির প্রতি আমার বিশেষ অনীহা। অথচ মাতঙ্গীর মন্দিরে যাবার একটা কৌতূহলও বোধ করছি।

সহসা ঠিন ঠিন ঠুন ঠুন শব্দে চমকিয়ে উঠে ওপর দিকে তাকালাম। এই প্রথম নজরে পড়ল, মাথার ওপরেই বিরাট ঝাড়-লণ্ঠন। তার পাশ ঘেঁষেই লম্বা লোহার রডে, অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে বিজলি পাখা। পাখাটা খুবই বেমানান লাগল, এবং ঝাড়-লণ্ঠনের দু পাশে দুটি সুবৃহৎ গোলাকার সাদা আলোর শেড। পাখা আর আলো, স্পষ্টতই অনেক পরের সংযোজন। ঝাড়বাতির আমলে বিজলি আসেনি, সেটাও বোঝা যাচ্ছে।

আবার পশ্চিমের খোলা দরজা দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে, আমার প্রথম মনে হল, ওটা থামওয়ালা বারান্দা না, অলিন্দ। আবার ঝনঝনানো

শব্দের সঙ্গে, দেখলাম, পশ্চিমের পার্টিশনের আড়াল থেকে, বাঁক কাঁধে একজন এগিয়ে আসছে। বাঁকের দু' দিকে দুটি সুবৃহৎ তামার হাঁড়ি থেকে ধোঁয়া উঠছে। হাঁড়ি দুটো শিকল দিয়ে বাঁধা, তারই শব্দ। লোকটি বাঁক কাঁধে এগিয়ে এল এ ঘরের দিকেই। ঘরে ঢুকে আমাকে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম ঠুকে বলল, 'বাবুজী গরম পানি।' বলে, একবার ডাইনে তাকাল, তারপর বাঁ দিকের ঘরে চলে গেল।

তার মানে কী? লোকটা জানে, বাঁ দিকের গোসলখানাতেই আমার স্নানের জায়গা, কারণ ও-ঘরটি আমার থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। কে বলে দিল ওকে একথা? ত্রিপুরারি তো আমাকে বলে গেলেন, আমি দু ঘরের যে-কোন ঘরে ইচ্ছা থাকতে পারি। আমি যদি দক্ষিণের ঘরটি নিজের জন্য বেছে নিতাম?

কিন্তু অন্য কেউ সম্ভবতঃ আমার জন্য উত্তরের ঘর নির্দিষ্ট করেছে। আমি উত্তরের ঘরে গেলাম। জলের কল খুলে দিয়ে বালতিতে জল পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। লোকটি শুধু বাঁক কাঁধে বেরিয়ে এসে হিন্দীতে বলল, 'ঠাণ্ডা পানি ভরতে দিয়েছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এই ঘরের গোসলখানায় কে তোমাকে গরম পানি দিতে বলল?'

লোকটি কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে বলল, 'শান্তা মাঈয়া!'

তার মানে, শান্তা মা? কে তিনি? কিন্তু আমি লোকটিকে আর কোন প্রশ্ন না করে, নির্বিকার থাকবার চেষ্টা করলাম, এবং মুখ ফিরিয়ে নিলাম, 'ঠিক আছে।'

লোকটি চলে গেল।

বিকেল ঘনিয়ে এল। শীতের প্রকোপ বাড়ছে। ও-বেলা আমি রঘুর সঙ্গে মাতঙ্গী মন্দির প্রাঙ্গণে গিয়েছিলাম। মাতঙ্গী দর্শন করেছিলাম। অষ্টধাতুর চতুর্ভুজা কালীমূর্তির মতই। কিন্তু চোখ-মুখ

যেন উগ্রচণ্ডী ধরনের। জিহ্বা দাঁতে কাটা না, তবে মুখ ব্যাদান করে আছেন। গলায়ও নৃমুণ্ডমালা নেই।

ত্রিপুরারি তখন লাল কাপড় পরে ছিলেন। কপালে লাল শিখার মত আঁকা। তাঁর অতি আয়ত চোখ আরো লাল দেখাচ্ছিল। দুজন ঢাকী ঢাক বাজাচ্ছিল। মন্দিরের সামনেই, পরিচ্ছন্ন হাড়ি-কাঠের চারপাশে কিছু বালি ছড়ানো ছিল। বলির ছাগশিশুটি বাঁধা ছিল একপাশে। তার গায়ের লোম দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তাকে স্নান করানো হয়েছে।

আমি যাদের সেখানে দেখেছিলাম, তারা অধিকাংশই বোধহয় গ্রামের বা আশেপাশের অন্ত্যজ পল্লীর নরনারী। কোনরকম হৈ চৈ হল্লা ছিল না। বরং একরকমের অতি-নৈঃশব্দই যেন বিরাজ করছিল, বিশেষতঃ ঢাকের শব্দ থেমে যাবার পরে। ত্রিপুরারি পূজায় বসেছিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে একবার হেসেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, মন্দিরের অভ্যন্তরে আরো কেউ আছেন, যাঁদের আমি বাইরে থেকে দেখতে পাইনি। ভিতরে ধূপ দীপ জ্বলছিল।

ত্রিপুরারি আমাকে একবার মাত্র বলেছিলেন, 'বাঁ দিকে যে পাথরের ভৈরব মূর্তিটি দেখছো—ভেতরে না, বাইরে—ওইটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে আমি আমাদের এক জলাশয় থেকে পেয়েছিলাম।'

ভৈরব মূর্তিটি মাতঙ্গীর যথার্থ দ্বারপাল হিসাবে রাখাই উদ্দেশ্য ছিল কী না, জানি না। বিশাল মূর্তিটি ছিল মাতঙ্গীর মন্দিরের বাঁ দিকের বারান্দার কোণে। আমি বলির আগেই ফিরে এসেছিলাম। আহারাদির ব্যবস্থা ছিল নানারকম। বাঙালীর সুক্তো ঝোল ডাল ভাত থেকে, রুটি পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা কাবাব দুরকম, এবং আচার। মাঝখানের ঘরে, পাথরের টেবিলে খাবার পরিবেশন করেছিল একটি অবাঙালী স্ত্রীলোক। রঘু সহায়তা করেছিল। তারপরেই সেই সধবা মহিলা এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ধূসর কেশের মাঝখানের সিঁথিতে লাল ডগড়গে সিঁদুরের দাগ। কপালে সিঁদুরের কোঁটা। এক লহমায় তাঁর বাঙালী তাঁতীর

তৈরি, লালপাড় সূক্ষ্ম শাড়িটি চিনতে আমার ভুল হয়নি, এবং সেই সঙ্গে বাঙালী আটপৌরে পরিধানের ধরন। পায়ে আলতা। অলঙ্কার যৎসামান্য, একটি গলার হার, শাঁখার সঙ্গে সোনার চুড়ি, নাকে একটি হীরার নাকছাবি। প্রৌঢ়া তিনি নিশ্চয়ই, দাঁত বাঁধানো কী না, বুঝতে পারিনি। তার চিকন কিরণে একটি স্নিগ্ধতা ছিল। তিনি অনায়াসে আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করেই যেন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আর কেউ নন, ত্রিপুরারি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। বলেছিলেন, 'খেতে বসো। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

আমিই বলেছিলাম, 'আপনি আবার ব্যস্ত হলেন কেন? আমি খেয়ে নিচ্ছি।'

'তা বললে কি হয়? তুমি খাবে, আমি থাকব না, তা হয় না।' তিনি বলেছিলেন, 'আজ শনিবার, ওঁর পূজা শেষে, খেতে অনেক বেলা, বিকেল গড়িয়ে যাবে। অবিশ্যি একবেলাই খান। তুমি বসে পড়। আমার সামনে সঙ্কোচ করো না। তোমার যা দরকার, রঘুকে বলতে পারো, ও এনে দেবে।'

আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। কী দরকার হতে পারে? রঘু কী এনে দিতে পারে? পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গিয়েছিল ত্রিপুরারির কথা। কিন্তু সচরাচর দিনের বেলা আমি মদ্যপান করি না। হেসে বলেছিলাম, 'আমার কোন কিছুরই আপাতত দরকার নেই।'

ঘিয়ের পাত্রটি সরিয়ে রেখে, আমি শুক্তো আর ঝোল-ভাতই খেয়েছিলাম। পুরোপুরি বাঙালী রান্না। উনি সামনে দাঁড়িয়ে না থাকলে হয়তো দু-এক টুকরো পেঁয়াজ আর কাবাবেই আমার খাওয়া হয়ে যেত। খাবার পরে পান। ব্যবস্থার কোন ত্রুটি ছিল না। আমার খাওয়ার শেষে উনি বিদায় নিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে পানপাতিয়া নামে অন্য স্ত্রীলোকটিও। রঘু আমাকে বলে' খাবার খেতে গিয়েছিল।

বাতাস এক সময়ে কিছুটা ঝিমিয়ে, আবার ঘোর দুপুরে বেড়ে উঠেছিল। ঝাড়-লণ্ঠনের ঠুং ঠাং জলতরঙ্গের মত ধ্বনি তুলছিল মাঝে

মাঝে। আমার ভিতরে সুর গুনগুন করছিল। বাতাসের সোঁ সোঁ, ঝাড়-লণ্ঠনের শব্দের মধ্যে, আমি যেন সুর আর লয় পাচ্ছিলাম। আমার ভিতরের সুর, স্বরে গুনগুনিয়ে উঠেছিল। আমি সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, গলার স্বরকে অনেকখানি মুক্ত করে দিয়েছিলাম।

এক সময়ে সহসা সামান্য শব্দে আমি সচকিত হয়ে দেখেছিলাম, ত্রিপুরারি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘরের আলো ইতি-মধ্যেই আবছা হয়ে উঠেছে। এখন তাঁর সেই লাল কাপড় পরা নেই। সকালের মতই ধুতি-চাদর পরা। তাঁকে দেখেই আমি থেমে গেলাম। উনি দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কি আজ রাত্রের গানের মহড়া চলছে?'

আমি ব্যস্ত ভাবে বললাম, 'না না, এমনিই একটু গুনগুন কর-ছিলাম।'

'মহড়া দেবে নাকি?'

'দরকার নেই।'

ত্রিপুরারি পিছন ফিরে ডাকলেন, 'শান্তা বেটি আয়, বিশ্বরূপের সঙ্গে তোকে আলাপ করিয়ে দিই।'

তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। তাঁর পিছনে এল সেই রমণীমূর্তি। আনিসা বেগমের প্রতিমূর্তি, আশ্চর্য মিল। ডান দিকের কাঁধের ওপর আঁচল, অবাঙালী ধরনে, পাড়হীন একটি হালকা গোলাপী রঙের শাড়ি পরা। চুলের রঙ কিছুটা পিঙ্গল, কিন্তু মসৃণ, এবং খোঁপা বাঁধা। নাকে একটি হীরার নাকছাবি ছাড়া, সারা গায়ে কোন অলঙ্কার নেই। বয়স কত? আমি অনুমান করতে পারি না। সিঁথিতে বা কপালে সিঁদুরের কোন চিহ্ন নেই। নিতান্ত তরুণী বলা যায় না। চোখে সম্ভবতঃ সরু কাজল বা সুরমা আঁকা। তবে আনিসা বেগমের দেহের নম্রতা, এই দেহে কিঞ্চিদধিক কম, যদিও উদ্ধত নয়, উজ্জ্বলতর, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে সেই গভীরতা, অথচ আনিসা বেগমের একান্ত নির্বিকার গাম্ভীর্য নেই। চোখের তারায় কৌতূহল, যদিও কৌতুকের আভাস

মাত্র নেই। ঠোঁটে ঈষৎ হাসি। দু হাত তুলে আমাকে নমস্কার জানাল। আমি অপ্রস্তুত লজ্জায় তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি, আমার চোখে অপার কৌতূহল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গেলাম। ত্রিপুরারি বাধা দিলেন, 'আরে বসো বসো, উঠতে হবে না। পরিবারের সকলের কথাই বলেছি, শান্তার কথা তোমাকে বলা হয়নি। শান্তাও আমাদের পরিবারের একজন।' বলে তিনি শান্তার দিকে তাকালেন। শান্তাও তাকিয়েছিল। দুজনের মুখেই হাসি ফুটল। ত্রিপুরারি আবার বললেন, 'শান্তা বিয়ে করেনি, গান-বাজনা নিয়েই থাকে। তবে ঘরানাটা তোমাদেরই, অল্‌খিয়া।'

আর একবার আমার বুকের মধ্যে চমকিয়ে উঠল। এই শান্তাও গায়িকা, এবং তার ঘরানা অল্‌খিয়া! আনিসা বেগমও তাই ছিলেন। আমার মনে পড়ছে, আনিসা বেগম গান ধরলে, মাঝখান থেকে ওস্তাদজী কী ভাবে তাঁর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠতেন। কিন্তু সত্যি কি এই শান্তা ত্রিপুরারির মেয়ে? তবে আনিসা বেগমের সঙ্গে এমন আশ্চর্য মিল শান্তার চেহারায় এল কী করে? যদি দুজনের বয়স এক হত, তা হলে, যমজ ভগ্নী ভাবতে অসুবিধা ছিল না। বয়সের তফাত রয়েছে।

আমি মেঝের ওপর পাতা উঁচু গদীর ওপরে বসেছিলাম। ত্রিপুরারি গদীর ওপর উঠে এসে, আমার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে বসলেন, ডাকলেন, 'আয় শান্তা, উঠে বোস্‌।'

শান্তা গদীর এক পাশে, কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে বসল। আমি কি সম্মোহিত হলাম? শান্তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। অস্বীকার করব না, শান্তাকে দেখে একটা মুগ্ধতা বোধ আমার মধ্যে জেগে উঠছে। কিন্তু আপাততঃ আমার চোখ না ফেরাতে পারার কারণ, তীব্র কৌতূহল। অথচ এটা শালীনতাবিরুদ্ধ, তাও বুঝতে পারছি। আমি দেখতে পাচ্ছি, শান্তার ফরসা মুখ ক্রমেই লাল হয়ে উঠছে, মুখ তুলতে পারছে না। কতক্ষণ আমি এরকম তাকিয়ে থাকতাম, আর শান্তার মুখ ক্রমাগত লজ্জায় ও অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠতে থাকত,

জানি না। ত্রিপুরারি তাঁর গম্ভীর স্বরে গলাখাঁকারি দিয়ে ডাকলেন, 'বিশ্বরূপ !'

আমি চমকিয়ে উঠে সচকিত হলাম, এবং নিজের আচরণে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে উঠলাম। শান্তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, ত্রিপুরারির দিকে ফিরে বললাম, 'আজ্ঞে বলুন।'

'আজ রাত্রে আমি আর শান্তা, শহরে তোমার গান শুনতে যাব।' ত্রিপুরারি বললেন, 'তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে যাব, একসঙ্গে ফিরব।'

আমি চকিতের জন্য একবার শান্তার দিকে দেখলাম। সে তাকিয়েছিল ত্রিপুরারির দিকে। অথচ মনে হল, সে যেন সত্যি সেইদিকেই তাকিয়ে নেই। বললাম, 'বেশ তো, ভালই হবে।'

'তোমাকে যারা এখানে গান গাওয়াতে এনেছে, তারা এর মধ্যেই বারকয়েক টেলিফোন করেছিল।' ত্রিপুরারি বললেন, 'আমি তাদের বলে দিয়েছি, রাত্রি দশটার পরে তোমাকে নিয়ে আমি যাব। খবর পেলাম, পণ্ডিতজী এসে পৌঁছেছেন, রাত্রি দশটা থেকে তিনি সেতার বাজাবেন। তারপরেই তোমার গান। তার মানে পণ্ডিতজী আড়াই ঘণ্টার মত বাজাবেন। পণ্ডিতজীর সেতারের পরেই তোমার গান, মানে, শ্রোতাদের আসর জমিয়ে তুলতে তোমাকে বেশ বেগ পেতে হবে।'

এসব কথা আমি কোন কালেই পছন্দ করি না, বিশ্বাসও করি না। বললাম, 'আমি ওসব আদৌ ভাবি না।'

এই মুহূর্তে শান্তা একবার আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল, তারপরেই ত্রিপুরারির দিকে। ত্রিপুরারিও শান্তার দিকে ফিরে বললেন, 'এর কথা ঠিক নাসিরার মত। গুরুর উপযুক্ত চ্যালা।'

শান্তার ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। কোন মন্তব্য না করে মুখ ফেরাল। আমি ভাবছিলাম আনিসা বেগমের কথা। ত্রিপুরারি তাঁকে চিনতেন। শান্তার সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ? শুধু 'পরিবারের একজন' বললে, কোন পরিচয় হয় না। যদিও প্রথমে তিনি শান্তাকে বেটি বলে সম্বোধন করেছিলেন। কিন্তু সেটাও কোন যথার্থ পরিচয় নয়। শান্তা

কি তাঁর কন্যা ?

'শান্তা আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, আজকের আসরে তুমি কী গাইবে।' ত্রিপুরারি বললেন, 'আমি বললাম, সেটা বিশ্বরূপকেই জিজ্ঞেস করা যাক। কিছু ঠিক করেছ নাকি ?'

আমি জবাব দেবার আগেই দেখলাম, শান্তা আমার দিকে তাকাল। আমি ত্রিপুরারির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আমি সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে গান করি। ওস্তাদজীর কাছ থেকে একটা বিষয় শিখেছি, শ্রোতাদের ইচ্ছামত গাইতে পারি না, গান করিও না। বেহাগের সময়ে ভৈরোঁ, কিংবা শেষরাত্রে হল্লাবাজরা টপ্পা শুনতে চাইলে আমি আসর ছেড়ে চলে যাই। তবে সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমি অনেক সময় মর্জিমত খাম্বাজী ঠুংরি বা টপ্পাও গাই। কখনো কখনো গজল। সব ব্যাপারটাই তো সময় আর মনের। তবে মূলতঃ তো আমি খেয়ালিয়া, খেয়ালই গাইব। কোন্ রাগে গাইব, সেটা নির্ভর করছে রাত্রের প্রহরের ওপর।'

ত্রিপুরারি ভুরু কুঁচকে তাকালেন শান্তার দিকে। শান্তা তাঁর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল। আমার মনে হল, দুজনের মধ্যে যেন অনুচ্চারিত কোন বাক্য-বিনিময় হয়ে গেল। ত্রিপুরারি বললেন, 'শুনলি তো শান্তা। আর কি বলবার আছে, বল্ ?'

শান্তা মুখ না ফিরিয়ে, মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তার আর কিছু বলবার নেই।

ত্রিপুরারি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আসরে যাবার আগে, এখন একবার গলা মাজতে বসবে নাকি ?'

বললাম, 'সে-রকম কিছু ভাবিনি। আমি অবিশ্যি সঙ্গে কারোকে নিয়ে আসিনি। এরকম বড় একটা হয় না। সব সময়েই দু-একজন সঙ্গে থাকে। নিয়মও তাই। তবে ভাস্করজী কলকাতা থেকে তাঁর চ্যালা-চামুণ্ডা কয়েকজনকে নিয়ে আসছেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তানপুরা ওঁর চ্যালারাই আমার সঙ্গে বাজাবে। ওঁর সারেঙ্গী,

মফিজ্জুলও আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে। তবলা বাজাবে নীতিশ ঘোষ। নীতিশ এর আগেও আমার সঙ্গে সঙ্গত করেছে।'

'তাই বল!' ত্রিপুরারি অবাক স্বরে বললেন, 'আমি কথাটা যে একেবারে ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু বলবার মত করে ভাবিনি। সচরাচর তোমরা তো একলা কোথাও গাইতে যাও না। তা তুমি তোমার শিষ্যদের আনোনি কেন?'

আমি তাঁকে প্রকৃত কৈফিয়ৎ দিতে পারলাম না যে, শিষ্য ও পারিষদবৃন্দ নিয়ে, তথাকথিত গায়কের জীবন আমি ত্যাগ করেছি। আমি নিজেকে নিয়েই থাকি। সুর তান লয়ের ঐক্য আমার অনুভূতির মধ্যে গ্রথিত। অবিশ্যি বুঝি, এভাবে পেশাদার গায়কের জীবন বেশি দিন চলতে পারে না। আমার জীবন-যাপনের প্রবাহ যে-ভাবে বহে চলেছে, তাতে পেশাদারী করা আমার শেষ হয়ে আসছে। পেশা যদি আমাকে ভারবাহী পশু করে তোলে, তা আমি সহ্য করতে পারি না। আমার খ্যাতি, অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি, ক্রমাগত আমাকে সেইদিকেই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জনতার হাততালি আমার কাছে চিরকালই হাস্যকর। এখন মাঝে মাঝে ভাবি, একলা এবং প্রকৃত গুণগ্রাহী দু-চারজনের সামনে গান করি। জনবহুল আসরে আর যাব না। যদিও এখনো পুরোপুরি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারিনি।

এ সেই ওস্তাদজীরই কথা, গানের থেকে জীবন বড়। জীবনই আমার কাছে নানা জিজ্ঞাসায় কণ্টকাকীর্ণ। সঙ্গীত আমার জীবন-চর্চার উপায়। জীবন-যাপনের নয়। সেইজন্য, একমাত্র গানের সময়েই আমার আত্মা, অবিমুগ্ধ সমাহিত থাকে। ত্রিপুরারির জবাবে আমি কেবল হাসলাম, এড়িয়ে গেলাম জবাব।

'না, না, এটা ঠিক নয় হে বিশ্বরূপ।' ত্রিপুরারি বললেন, 'তোমাকে দেখে ইস্তক আমার মনে হয়েছে, তোমার মধ্যে কোন অসঙ্গতি আছে। তুমি সুখী নও, সে-কথা আমি বলতে চাই না, ও কথাটার কোন অর্থই নেই। যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকো, সেটা মোটেই

ভাল কথা না। জীবনকে কোনরকমেই এড়িয়ে যেও না। ওই ব্যাধিটাকে আমি খুব ভাল জানি। দেখো, উপদেশ বলে ভাবছ না তো?'

আমি বললাম, 'না না, আপনার কথা আমার ভাল লাগছে।'

'নাসিরা কখনো জীবনকে এড়িয়ে চলত বলে আমি জানতাম না।' ত্রিপুরারি বললেন, 'সে ছিল সব কিছু আর সকলের মধ্যে। সব-কিছুর মধ্যে থেকেই সে নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খান ছিল।'

আমি অবাক মুগ্ধ স্বরে বলে উঠলাম, 'আপনার প্রত্যেকটা কথাই সত্যি। কিন্তু তাঁর সব গুণ আমি পাইনি।'

'সব গুণ না পাও, তার মত জীবনের অর্থকে খুঁজে পেতে হবে। যদি সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাও, তা হলে ভুল হবে। কারণ, এই সংসারেই সব আছে। তা মোক্ষই বল, আর পরিপূর্ণতাই বল। তোমাকে তা খুঁজে পেতে হবে। জীবনকে বাদ দিয়ে কিছুই কিছু নয়।'

আশ্চর্য! ওস্তাদজীর সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে তাঁর প্রতিটি কথা। এ শিক্ষাও কি অলখিয়া প্রকাশজীর কাছ থেকে পাওয়া? আমি শান্তার দিকে তাকালাম। সে আমার মুখের দিকেই দেখছিল। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নামিয়ে নিল। কিন্তু কোনরকম লজ্জার ছটা তার মুখে ঝলকিয়ে উঠল না। এ অভিব্যক্তি একান্তই যেন আনিসা বেগমের। অথচ আমি একটা ব্যাকুলতা বোধ করছি, অথবা একটা আবেগ, যা সচরাচর আমার ঘটে না।

এই সময়ে রঘুর সঙ্গে আর একজন, তানপুরা, হারমোনিয়ম আর ডুগি-তবলা নিয়ে ঢুকল। সহসাই যেন সকলের খেয়াল হল, ঘরে অন্ধকার নেমে এসেছে। শান্তা নিজে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ত্রিপুরারি বললেন, 'এখন বাজে সাড়ে ছ'টা। হাতে অনেক সময় আছে। তুমি শান্তার গান একটু শোন।'

আমি দেখলাম, শান্তা ত্রিপুরারির দিকে একবার তাকিয়ে, মাঝের

ঘরে চলে গেল। রঘু এবং অন্য লোকটি তখন তানপুরা, হারমোনিয়ম আর ডুগি-তবলার ঢাকনা খুলে, একটি ছোট হাতুড়ি সহ সব রেখে ঘরের বাইরে চলে গেল। শান্তার গানের আয়োজন ত্রিপুরারি নিশ্চয় আগেই স্থির করে, তাকে নিয়ে আমার এখানে এসেছেন। অন্যথায় এইসব যন্ত্রাদি আসত না।

ত্রিপুরারি ডাকলেন, 'শান্তা।'

শান্তা মাঝের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি ত্রিপুরারির দিকে।

দৃষ্টিতে অভিযোগ, না তিরস্কার, অভিমান, না ক্ষোভ, আমি বুঝতে পারলাম না। দেখলাম, তার মুখে হাসি নেই। ত্রিপুরারি ঘাড় ঝাঁকিয়ে ডাকলেন, 'আয়। তুই তো এ-সময়ে এমনিতেই গানে বসতিস। বিশ্বরূপের এখানেই সেটা হোক।' বলে তিনি হারমোনিয়মটা নিজের কাছে টেনে, স্টপার খুলে, দ্রুত হাতে রিডের ওপর আঙুল চালালেন।

শান্তা আস্তে আস্তে জাজিমের ওপর এসে বসল। তানপুরা তুলে নিয়ে তারে ঝংকার দিল। ত্রিপুরারি হারমোনিয়মের বিশেষ বিশেষ রিডের ওপর আঙুল টিপলেন। শান্তা তানপুরার কান মুচড়ে, টেনে, ঢিল দিয়ে, ঠিকমত বেঁধে নিল। কিন্তু গলা থেকে স্বর বের করল না। বস্তুত, এখন পর্যন্ত শান্তা একটি কথাও বলেনি, তার কণ্ঠস্বর শুনিনি।

ত্রিপুরারি শান্তার তানপুরার ঝংকারের সঙ্গে, তবলা বাঁধলেন হাতুড়ি ঠুকে।

তারপরে আমার দিকে ফিরে বললেন, 'বিশ্বরূপ, তানপুরাটা ধরবে নাকি?'

ধরা অর্থে বাজানো। অন্য কারোর ক্ষেত্রে, অন্য সময় হলে, কী করতাম জানি না। আমি যেন একটা শক্তির দ্বারা সম্মোহিত হচ্ছিলাম। আগ্রহের সঙ্গেই বললাম, 'নিশ্চয়ই।'

ত্রিপুরারি শান্তার হাত থেকে তানপুরাটা নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

আমি তানপুরা নিয়ে, তারে আঙুল চালালাম। আমার মুখ ছিল পুব দিকে, শাস্তা যেদিকে বসেছিল। আমার বাঁ পাশে ত্রিপুরারি। শাস্তার মুখ দক্ষিণে, মাঝের ঘরের দিকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ, কেবল আমার হাতের তানপুরার ঝংকার ছাড়া। শাস্তা ঘুরে হাত বাড়িয়ে ত্রিপুরারির তুই পায়ে স্পর্শ করে কপালে মাথায় ছোঁয়াল। তিনি ওর মাথায় হাত স্পর্শ করলেন। শাস্তা আমার দিকে ফিরে তু হাত কপালে ছোঁয়াল। আমি হাত তুললাম না। তানপুরার গায়েই কপাল স্পর্শ করলাম।

শাস্তা সুর ধরল।

আলাপের প্রথম ধরতাই থেকেই, দরবারি রাগ স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কানে। এবং আমি চমকিয়ে উঠলাম শাস্তার গলার স্বরে। তার স্বর রীতিমত চিকন, মাজা ও সুরেলা, কিন্তু অবিকল না হলেও, এই স্বরের মধ্যে কোথায় যেন আনিসা বেগমের স্বরের প্রতিধ্বনি বেজে উঠছে। আলাপ ক্রমেই দ্রুততর হয়ে, বাণীকে প্রকাশ করল। কিন্তু আনিসার তুলনায়, এই গায়কী অনেক মার্জিত, শিক্ষিত এবং মধুর। আমি যেন আমার ওস্তাদজীর গায়কী বাঢ়ত বহলাওবার কারুমিতিও পাচ্ছি, যা আমাকে মুগ্ধ আর আচ্ছন্ন করে তুলল। গানটিও আমার পুরোপুরি জানা। এ গান আমি ওস্তাদজীর কাছেই শিখেছি। 'ইয়ে শাম কো আসমান আঁখ কিসিকি ?'

শাস্তার গলায় এ গান এ ভাবে শুনে, আমি ওর এই ধারা প্রবাহের পথ বুঝে উঠতে পারছি না। কে ও ? কোথা থেকেই বা গানের এই ঘরানায় ওর আগমন এবং দখল ? ত্রিপুরারি কি ওর গুরু ? তিনি তো শুনলাম, গান ছেড়ে দিয়েছেন। অন্তত: তাঁর কোন পরিচয় নেই। ইতিমধ্যে তিনি তবলা ধরেছিলেন।

আমি চোখ বুজে গান শুনতে শুনতে, এক সময়ে সহসাই শাস্তার স্বরে স্বর মিশিয়ে গেয়ে উঠলাম। উঠেই তৎক্ষণাৎ থেমে চোখ খুলে তাকালাম। শাস্তার চোখ আমার দিকে, তার চোখ মুখে আবেগের

অভিব্যক্তি। ত্রিপুরারি আমাকে বললেন, 'গাও বিশ্বরূপ।'

আমি আবার চোখ বুজলাম, শান্তার স্বরে স্বর মিলিয়ে গাইতে লাগলাম। তারপরে এক জায়গায় হঠাৎই আমাকে থামতে হল। কারণ ও যেন জাদু বলে, দরবারি তরাণায় বেগে, দ্রুত লয়ে ধাবিত হল। ত্রিপুরারি অবাক হলেও, তবলা ছাড়লেন না, বাজিয়ে চললেন। দেখলাম, শান্তার একটি হাত নাচের ভঙ্গিতে তুলে উঠল। ও কি নাচবে? এই তরাণায় নাচ প্রশস্ত।

কিন্তু শান্তা নাচল না, বরং চোখে-মুখে কয়েকটি তির্যক ভঙ্গি করল। সেই মাঝের ঘরের দিকে মুখ রেখেই। আমি যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। শান্তা গান থামিয়ে দিল।

আমার স্বপ্নভঙ্গ হলেও, চোখের অপার কৌতূহলের সঙ্গে গভীর মুগ্ধতার আবেশ ফুটে উঠল। আমি ত্রিপুরারিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'উনি কার কাছে শিখেছেন?'

'ও নিজেই শিখেছে।' ত্রিপুরারি বললেন, 'গান ওর রক্তে।'

শান্তা এই প্রথম কথা বলল, 'না না, আমি ওঁর কাছেই গান শিখেছি।' ত্রিপুরারিকে দেখাল।

ত্রিপুরারি বললেন, 'শেখাবার মত দখল আমার নেই। ওর নিজের মধ্যেই যা ছিল, তাকে আমি উস্‌কে দিয়েছি।'

এসব কথার দ্বারা কিছুই পরিষ্কার হল না। তবু আমি বুঝে নিলাম ত্রিপুরারিই শান্তাকে গান শিখিয়েছেন। তিনিও অল্‌খিয়ার শিষ্য ছিলেন। শান্তার গান শুনে মনে হল, সে যেন আমার ওস্তাদজীর হাতে তৈরি। আনিসা বেগমের তুলনায়, অনেক বেশি তার চিকন কাজ।

ত্রিপুরারি বললেন, 'শান্তা, আজ বিশ্বরূপের সঙ্গে তুই তানপুরা নিয়ে বসবি।'

শান্তা ঘাড়ে একটা ঝাপটা দিয়ে, ত্রিপুরারির দিকে তাকাল। ওর দুই চোখে বিস্ময় এবং অবিশ্বাস। ত্রিপুরারি হেসে শান্তভাবে বললেন, 'ওর নিজের লোক কেউ নেই। ভাস্করজীর চ্যালারা বসবে। তার

চেয়ে তুই বসা ভাল। তোরা তো এক জায়গা থেকেই এসেছিস।'

শান্তা তথাপি একটি কথাও বলল না, অপলক চোখে ত্রিপুরারির দিকেই তাকিয়ে রইল। ত্রিপুরারি শান্তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বললেন, 'আমিও তোর সঙ্গে বসব। তুই আর আমি দুজনে তানপুরা ধরব। কী হে বিশ্বরূপ, কেমন হবে?'

আমি বলে উঠলাম, 'আমার সৌভাগ্য!'

'জয় অল্‌খিয়া প্রকাশজী!' ত্রিপুরারি বললেন, 'ঠিক আছে তো রে শান্তা?'

শান্তা নিচু স্বরে জবাব দিল, 'আপনার যা অনুমতি।'

শান্তার কথায় আমার বুকে ঠেকে থাকা একটা পাষাণভার যেন নেমে গেল।

অহঙ্কার না, গানের আসরের কথা আমি পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। পণ্ডিতজীর সেতারের শেষ রাগ ছিল বেহাগ। আমার শুরুও ছিল বেহাগ। শান্তা আর ত্রিপুরারি আমার আসরে থাকায়, শ্রোতাদের মধ্যে একটা বিস্ময়ের চমক সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষ করে, দুজনের তানপুরা নিয়ে বসায়। স্থানীয় উদ্যোক্তারাও এটা আশা করেনি। শান্তা যে স্থানীয় অধিবাসীদের অপরিচিতা, তা বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি। অথচ শান্তা ত্রিপুরারির পরিবারেরই একজন। শহর থেকে যদিও দূরে, তথাপি কেউ তাকে চেনে না, এটা আমার কাছেও বিস্ময়কর। এর থেকে প্রথমেই আমি যা অনুমান করেছিলাম, তা হল, শান্তা কখনো জনসাধারণের সামনে গান করেনি। আমি আশা করিনি, শান্তা আমার সঙ্গে গলা মেলাবে। কিন্তু মিলিয়েছিল। আমি থেমে গিয়ে, ওর একক স্বর শোনাবার অবকাশ দিয়েছিলাম। ও তৎক্ষণাৎ থেমে গিয়েছিল। ও ওর একক স্বর শোনাতে চায়নি।

শ্রোতাদের উল্লাসের ধ্বনি উঠেছিল। রাত সাড়ে তিনটেয় আমি

শেষ পর্যন্ত, একটি ঠুংরি শুনিয়ে আমার গান শেষ করেছিলাম। আর কোনরকমেই বসিনি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ত্রিপুরারি আর শাস্তার সঙ্গে, মাতঙ্গীবাড়ি ফিরে এসেছিলাম। গানের সাফল্য নিয়ে আমার কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু শাস্তার সাহচর্যের জন্যই বড় উন্মুখ হয়ে উঠেছিলাম। আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। আমি ওর পরিচয় জানবার জন্য কৌতূহল দমন করতে পারছিলাম না।

এ সবই গত রাত্রের কথা। এখন স্নানাদি সেরে, প্রাতরাশ খেয়ে, চুরুট টানতে টানতে শাস্তার কথাই ভাবছি। রাত্রি চারটের পরে বাড়ি ফিরে, শাস্তা কোন রকমে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, চক-মেলানো উঠোন পেরিয়ে, পশ্চিম মহলে চলে গিয়েছিল। আমি অত্যন্ত আশাহত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম। ত্রিপুরারির সঙ্গে পুবের মহলে আমার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, রঘু তখনো আমাদের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। ত্রিপুরারি জিজ্ঞেস করে-ছিলেন, আমি শুয়ে পড়ব কা না।

আমি সঙ্কোচের সঙ্গেই বলেছিলাম, আমি একটু পান করতে চাই। ত্রিপুরারি তৎক্ষণাৎ রঘুকে বোতল আর পানপাত্র সাজাতে বলেছিলেন। তিনি নিজেও আমার সঙ্গে, মাঝের ঘরে টেবিলে পানীয় নিয়ে বসে-ছিলেন। বলেছিলেন, 'অনেক কাল পরে জীবনটা আজ একটু মোড় নিল। তবে তুমি আজ কামাল করেছ। মনে হল, বহুকাল পরে নাসিরার গান শুনলাম।'

আমি কৃতজ্ঞ বোধ করেছিলাম, কিন্তু আমার সমস্ত মস্তিষ্কের কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়েছিল শাস্তা। অথবা বলা যায়, বিদ্ধ হয়েছিল। আমি আমার চিন্তা-ভাবনাকে কোন দিকেই যেন চালনা করতে পার-ছিলাম না। সন্ধ্যাবেলা থেকে, জন-আসরে, আমি সর্বক্ষণই এক আনন্দের জোয়ারে ভাসছিলাম। মদ্যপানের সময়ও, আমার অন্তরের হতাশার তটে তটে সেই আনন্দের তরঙ্গ দোলা দিয়ে যাচ্ছিল। অথচ ঘনিয়ে আসছিল বিষাদও।

আশ্চর্য ! আমি অনুভব করতে পারছিলাম, শান্তা বেশ নির্বিকার ছিল। সহযোগিতা, শালীনতা এবং সহবত, সবকিছু রক্ষা করেও, সে যেন সম্পূর্ণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ছিল। আমি দ্রুত দু পাত্র পান করার পরেই, আর নিজেকে দমন করতে পারিনি, ত্রিপুরারিকে বলেছিলাম, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

ত্রিপুরারি নিরুৎসুক স্বরে বলেছিলেন, 'কর।'

'উনি কে ?'

'উনি মানে—তুমি, শান্তার কথা জিজ্ঞেস করছ ?'

'হ্যাঁ।'

'বললাম তো, ও আমাদের পরিবারের একজন।'

সম্ভবতঃ মদ্যপানই আমার মুখ খুলিয়ে দিয়েছিল, বলেছিলাম, 'আপনি যদি এর বেশী কিছু না বলতে চান, আমি জোর করতে পারি না। কিন্তু শান্তার মত একজন মহিলার এইটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট নয়।'

'কী পরিচয় তুমি জানতে চাও ? আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কের পরিচয় ?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'ওকে তুমি আমার কন্যা ভাবতে পার।'

'ভাবতে পারি ?'

'হ্যাঁ, মেয়ের মতই। ওকে আমি ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি।'

ত্রিপুরারি আর কিছু বলেননি। কিন্তু আমার কৌতূহল বেড়েছিল ছাড়া কমেনি। ছেলেবেলা থেকে ? কোথায় পেলেন ? কে ওর বাবা-মা ? কেনই বা তাঁকে মানুষ করতে হয়েছে ? ত্রিপুরারি হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'শান্তাকে তোমার কেমন লাগল ?'

আমি সহসা কোন জবাব দিতে পারিনি। পানীয়র দ্রব্যগুণে, মন যতই অবারিত হোক, বাধা অনুভব করেছিলাম। ছোট জবাব দিয়েছিলাম, 'খুবই ভাল।'

'কেবল ভাল ? আর কিছু না ?' ত্রিপুরারি তাঁর অতি আয়ত চোখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখেই যেন আমার সহসা আনিসা বেগমের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, আসল কথাটাই তো ভুলে যাচ্ছিলাম। মুগ্ধতা আমার কৌতূহলিত জিজ্ঞাসাকে আড়াল করেছিল। আমি অকপটেই বলেছিলাম, 'শান্তাকে দেখে, বিশেষ একজনের কথা আমার মনে পড়ে গেছল। তুজনের মধ্যে আশ্চর্য মিল, তফাৎ শুধু বয়সে।'

'কে সে ?' ত্রিপুরারি আবার কিছুটা নিরুৎসুকভাবে তাঁর গেলাসে চুমুক দিয়েছিলেন।

আমার মনে হয়েছিল, আমার জবাবটি তাঁর জানা। বলেছিলাম, 'আনিসা বেগমের কথা আপনার মুখেও আজ শুনেছি।'

'হ্যাঁ, তাতে কী ?'

'আনিসা বেগমকে আমি অনেকবারই দেখেছি। আমি শান্তাকে দেখে প্রায় ভুল করেছিলাম, তাঁকেই দেখছি কী না। কী করে এই মিল হতে পারে, আমি জানি না।'

ত্রিপুরারি হেসেছিলেন, 'স্বাভাবিক। মানে, আমি বলছি এটাই তো স্বাভাবিক। কোন সম্পর্ক না থাকলে, এমন আশ্চর্য চেহারার মিল কেমন করে থাকবে ?'

আমার চোখ নিশ্চয়ই মদ্যপানে আরক্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ত্রিপুরারির জবাব শুনে, আমার অপার কৌতূহল অন্তঃহীন বিস্ময়ে ঝলকিয়ে উঠেছিল। আমি সহসা কোন কথাই বলতে পারিনি। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ত্রিপুরারি তাঁর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'রঘু তোমার খাবার গরম করেছে, খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো, কাল সকালে দেখা হবে।'

আমি প্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ব্যস্ততায় বলে উঠেছিলাম, 'না না, রাত্রে আর আমি কিছুই খাব না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। দয়া করে বসুন, আমি আমার কথার জবাব এখনো পাইনি।'

ত্রিপুরারি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তাঁর অতি আয়ত চোখও লাল ছিল, এবং তার থেকে বেশি ছিল একটা রহস্যের

দ্যুতি। তার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠেছিল। তিনি আমার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে বলেছিলেন, 'বিশ্বরূপ, অধৈর্য হয়ো না। আমি তোমাকে অকারণেই এখানে নিয়ে আসিনি, বা রাখতে চাইনি। নাসিরার খাঁটি চ্যালাই বলো, আর ঘরানাই বলো, তোমাকেই তার প্রতিনিধি বলে সারা দেশ জানে। সিরাজুদ্দিন নাসিরার দামাদ (জামাই) হতে পারে, কিন্তু তোমার মত খাঁটি ঘরানার গায়ক বলে নাম-সম্মান পায়নি। ব্যস্ত হয়ো না। তোমাকে কিছু বলব বলেই তো থাকতে বলেছি। কিন্তু রাত শেষ হয়ে এল, আর নয়। কাল তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে।'

ত্রিপুরারি তাঁর ছড়িটি তুলে নিয়ে, স্বর চড়িয়ে আদেশ দিয়েছিলেন, 'রঘু, বাবুজি খানা খাবেন না। তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে, তুমি শুয়ে পড়বে।' বলে, তিনি আর এক মুহূর্তও দাঁড়াননি। দ্রুত ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন।

আমি আর্ত ব্যাকুল চোখে তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। পায়ের জুতোর মস্ মস্ শব্দ তুলে তিনি পশ্চিমের অলিন্দে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন। আর আমি যেন এক অজ্ঞাত রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়ে ছটফট করছিলাম। অতি অল্প সময়ের মধ্যে কতখানি পরিমাণ পান করেছিলাম, কোন হিসাব নেই। এক সময়ে, জামাকাপড় না বদলিয়েই, গায়ের শালশুদ্ধ টলতে টলতে পাশের ঘরে গিয়ে, খাটের ওপর লুটিয়ে পড়েছিলাম। অনেক কাল পরে, মদে আমার প্রকৃত নেশা হয়েছিল, যা ইদানীং প্রায় অনুভবই করতাম না। আমার চোখের সামনে ভাসছিল কেবল দুটি মুখ। শান্তা আর আনিসা বেগমের। আর কানে বাজছিল ত্রিপুরারির সেই কথা, 'কোন সম্পর্ক না থাকলে, এমন আশ্চর্য চেহারার মিল কেমন করে থাকবে?'...

এখন, এই সকালবেলায়, গতকাল রাত্রের মত্ততা আমার নেই। স্নান প্রাতরাশ সেরে, বেশ সুস্থই বোধ করছি। পুবদিকের দরজা-জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ঘরের মেঝেয় এবং জাজিমের ওপর। আমি

একটা আরামকেদারায় বসে আছি। আমার হাঁটু অবধি রোদ লাগছে। রেলিং-ঘেরা বারান্দায় গিয়ে, সারা গায়ে রোদ লাগাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু আমি আমার ইচ্ছামত উঠতে পারছি না। স্নানাদির পরে, আমি সুস্থতা বোধ করলেও, আমার সারা প্রাণ জুড়ে যেন কী এক অসুখ। যে-অসুখ আধিব্যাধি জ্বালা পোড়ার মত পুড়িয়ে মারে না। এ অসুখ, এক সীমাহীন মৌন রহস্যের কঠিন দরজায় কেবল মাথা কুটে মরে।

কেন এই মাথা কুটে মরা, তাও আমি অনুভব করতে পারছি। সংসারের পরম বিস্ময়, মানুষ তার নিজের কাছে অনাবিষ্কৃত থাকে, অথচ সে বিশ্ব আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে ওঠে। আজকের যুগের মানুষের সেটাই বিড়ম্বনা, সে নিজেকে জানতে চায়। নিজেকে আবিষ্কারের বাসনা তার মনে। পাশ্চাত্ত্যের মানুষ এ নিয়ে অনেক ঢাক-ঢোল পেটানো দার্শনিকতার বাণী ছড়ায়। কিন্তু ভারতের এটাই প্রাচীনতম দর্শন, আত্মজিজ্ঞাসা। আপনাকে জানা।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য, আমি উপলব্ধি করছি, গতকাল শান্তাকে দেখার পর থেকেই, আমার ভিতরে একটা ব্যাকুলতা জেগেছে। যে-ব্যাকুলতা, নিতান্ত একটি রমণীর সঙ্গলাভের মত সুলভ ব্যাকুলতা না। গত সন্ধ্যায় তার গান শোনার পরে, আমার ব্যাকুলতা একটি প্রত্যক্ষ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই পরিবর্তন যেন, ওস্তাদজীর কথিত সেই 'আনন্দে'র অনুভূতি। শান্তা এবং তার গান, আমাকে যেন সেই অনির্বচনীয় আনন্দের সন্ধান দিয়েছিল। যদিও তা কেবল মাত্র সেই সময়টুকুর জন্যই।

কিন্তু শান্তা কে ? কী সম্পর্ক তার থাকতে পারে আনিসা বেগমের সঙ্গে ? আর সেই সম্পর্কের সঙ্গে, তার এই পরিবারে অবস্থানেরই বা কী যুক্তি ?

আমার মনের এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই, ত্রিপুরারির ডাক শুনতে পেলাম, 'কোথায় হে বিশ্বরূপ ?'

ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ এগিয়ে এল। আমি

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। হাতের চুরুট লুকোবার চেষ্টা করলাম। ত্রিপুরারি ছড়িসহ হাত তুলে বললেন, 'আরে ওটা আবার কী করছ? আমার সামনে তুমি চুরুট টানতে পার, ওসব ফলস্ রেসপেক্ট সম্পর্কে আমার কোন মোহ নেই। একটু ঘুমোতে পেরেছিলে তো?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে চলো, তোমার ওস্তাদজীর জন্মভিটাটা দেখে আসি।' ত্রিপুরারি আমাকে বিস্মিত আর হতাশ করে বললেন, 'আমি গাড়ি বের করতে বলেছি।'

দেখলাম, ত্রিপুরারি ধুতি পাঞ্জাবি শাল গায়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। অথচ আমার ব্যগ্র প্রত্যাশা ছিল ভিন্নতর। শান্তা এবং আনিসা বেগমের প্রসঙ্গ ছাড়া আমি আর কিছু ভাবছিলাম না। কিন্তু তিনি সে-বিষয়ে কোন কথাই বললেন না। বরং আমাকে তাড়া দিয়ে আবার বললেন, 'তোমার তো পায়জামা পাঞ্জাবি পরাই আছে। একটা গরম যা হোক কিছু গায়ে জড়িয়ে নিয়ে চলো। আমরা যাব নেহাতই একটা গ্রামে।'

আমি বুঝলাম, এখন আর কোন কথাই হবে না। তা ছাড়া ওস্তাদজীর জন্মভিটার প্রতিও আমার বিশেষ আকর্ষণ। রঘুর পাট করে রাখা শালটা আমি টেনে নিলাম খাটের রেলিং থেকে, এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে ত্রিপুরারিকে অনুসরণ করলাম।

বাড়ির বাইরে এসে দেখলাম, গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিছনের সীটের এক কোণে শান্তা বসে আছে। ওর মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানা। প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমার সঙ্গে ওর একবার মাত্র চোখাচোখি হল। ওর চোখে কোন কৌতুক বা ঔৎসুক্য কিছুই ছিল না। ত্রিপুরারি গাড়ির সামনের দরজা খুলে বললেন. 'বিশ্বরূপ, বসে পড়ো।'

আমি সামনের আসনে বসলাম। ত্রিপুরারি পিছনের আসনে গিয়ে বসলেন। তারপরে ড্রাইভার উঠে গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল। মাত্র কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই, একটি নদীর ধার দিয়ে, গাড়ি একটি

দোকানপাট হাটবাজারের সামনে এসে দাঁড়াল। ত্রিপুরারি দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, 'এসো বিশ্বরূপ, এখান থেকে আধ-মাইলটাক হেঁটে আমাদের নাসিরার গ্রামে ঢুকতে হবে।'

আমি নামতে সামনেই দেখলাম, শান্তা তার পাশের দরজা খুলে নেমে পড়েছে। সেই উত্তর-পশ্চিমা বাতাস শুরু হয়েছিল। শান্তাকে ওর শাড়ি আর ঘোমটা সামলাতে হচ্ছিল। মুহূর্তেই আমার মাথার চুল চোখ ঢেকে দিল। রীতিমত এলোমেলো অবস্থা। তার সঙ্গে ধুলো উড়ছে। আশেপাশের লোকজনরা আমাদের দিকে দেখছিল। বিশেষভাবে ত্রিপুরারিকেই তারা দেখছিল, আর নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলি করছিল।

ত্রিপুরারি আগে আগে চলছিলেন। তাঁর পাশে পাশে শান্তা। আমি পিছনে। গরুর গাড়ি চলা কাঁচামাটির রাস্তা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছিলাম। রাস্তা একেবারে সমতল না, কিছু উঁচু-নিচু। গাছপালা প্রায় চোখেই পড়ে না, চারদিকে কেমন একটা রিক্ততা, এবং তার সঙ্গে এই হু হু বাতাসে একটা ক্ষ্যাপা বাউলের বৈরাগ্যের সুর বাজছে।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমরা তালগাছ ঘেরা একটা পুকুরের সামনে এসে পড়লাম। পুকুরের একপাশে একটি প্রাচীন ছোট মসজিদ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতগুলো ঘর। অধিকাংশই মাটির দেওয়াল, আর খোলার চাল। কোন কোন ঘরের মাথায় টালি। নিতান্ত দরিদ্র একটি বস্তি। কিছু বাচ্চা ছেলে-মেয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আমাদের পিছু নিল।

ত্রিপুরারি বললেন, 'এই হচ্ছে নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খানের গ্রাম আর জন্মস্থান।'

আমি দেখলাম, শান্তা আমাদের আগে আগে এগিয়ে চলেছে। এখন আমি আর ত্রিপুরারি ওর পেছনে। সারি সারি কয়েকটি ঘর, গায়ে গায়ে জড়ানো, এবং একটি বড় বটগাছ বাতাসে ঝাপটা দিচ্ছে। শাদা গোঁফ-দাড়িসহ একজন বৃদ্ধ মুসলমান এগিয়ে এসে, প্রথমে শান্তার

সঙ্গে কী কথা বললেন। তারপরে ত্রিপুরারিকে দেখে, কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম জানালেন। ত্রিপুরারিও সেলাম করলেন, দেশীয় হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন নিজামুদ্দিন সাহেব ?'

'খোদা যেমন রেখেছেন।' বৃদ্ধ নিজামুদ্দিন জবাব দিলেন, এবং আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

ত্রিপুরারি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এর নাম বিশ্বরূপ, নাসিরার পয়লা নম্বর চ্যালা, তামাম হিন্দুস্থানে ওর নাম।'

নিজামুদ্দিন অবাক মুগ্ধচোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। ত্রিপুরারি বললেন, 'ও ওর ওস্তাদজীর জন্ম-ভিটা দেখতে এসেছে।'

নিজামুদ্দিন সোৎসাহে বললেন, 'এসো বেটা, নিশ্চয়। এ তো তোমাদেরই মক্কা। তবে সে ঘর-দোর কিছুই তো নেই। এখন বেবাক বদলে গেছে।'

ত্রিপুরারি আমাকে বললেন, 'বিশ্বরূপ, এই নিজামুদ্দিন হলেন নাসিরুদ্দিনের পিসতুতো ভাই। নাসিরার নিজের আর কোন ভাই-বোন ছিল না। ওর পিসীমাই এ বাড়িতে ছিলেন। চলো, ভেতরে চলো।'

ত্রিপুরারি এবং নিজামুদ্দিন সাহেবকে অনুসরণ করে, আমি একটি ঘরের মধ্যে দিয়ে, খোলা উঠোনের ওপরে চলে এলাম। দেখলাম, আরো দুটি ছোট ঘর দুই পাশে রয়েছে। সামনের বড় ঘরটা আসলে প্রাচীর এবং বাইরের ঘর, দুয়ের কাজ চালায়। হঠাৎ আমার চোখ পড়ল, শান্তা উঠোনের এক প্রান্তে, মাটির পাঁচিলের পাশে, মাটির ওপর বসে আছে। অবাক হয়ে দেখলাম, ওর মাথার ঘোমটা খোলা। রুক্ষ একটি মোটা বিনুনি জামার পিঠে এলিয়ে পড়ে আছে।

নিজামুদ্দিন সেইদিকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'ওখানেই আমার মামার একটা ঘর ছিল, এখন নেই। সেই ঘরে নাসিরার জন্ম হয়েছিল।'

কিন্তু শান্তা ওখানে গিয়ে ওরকম মাটির ওপরে পিছন ফিরে বসে আছে কেন ? ঘর থেকে মহিলারা, আর আশেপাশের শিশুরা আমাদের দেখছিল। আমি ত্রিপুরারির সঙ্গে এগিয়ে গেলাম, এবং আমাদের

পায়ের শব্দেই যেন শান্তা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়াল।

আমি কল্পনা করার চেষ্টা করলাম, শূন্য স্থানটিতে একটি ঘরের ছবি। আর ওস্তাদজীর মুখ আমার মনে পড়ে গেল। তাঁর মুখ মনে পড়া মাত্রই, আমার মধ্যে একটা তীব্র আবেগের সঞ্চার হল। আমি যেন তাঁর স্পর্শ অনুভব করলাম, আর তাঁর কথা, 'বিশু, সুখের আশা কোনদিন করিস না। তবে আনন্দ চাই, মাঝে মাঝে আনন্দ অনুভব না করলে, জীবনের স্বাদ পাওয়া যায় না।'…আমি তাঁর চোখের জল দেখেছি, তাঁর গভীর ব্যথিত মুখ দেখেছি, তাঁর শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শুনেছি। আমি নিচু হয়ে সেই মাটিতে হাত স্পর্শ করলাম, কপালে ছোঁয়ালাম। সহসাই কী এক আবেগে আমার চোখে জল এসে পড়ল, যা গোপন করার কথা আমার চিন্তায় এল না।

ত্রিপুরারি আমার কাঁধে হাত রাখলেন।

ওস্তাদজীর গ্রাম থেকে ফেরার পরে সারাদিন আমার সঙ্গে আর ত্রিপুরারির দেখা হয়নি। দুপুরবেলা খাবার সময় যথাবিহিত বাড়ির গৃহিণী এসেছিলেন। মায়েদের মতই, নানা রকমে, খাবার জন্য পীড়া-পীড়ি করেছেন। আমার যথাযোগ্য যত্নের কোনই ত্রুটি হয়নি। কিন্তু এখন বেলা শেষ হয়ে এল, ছায়া ঘনিয়ে আসছে। সেই উত্তর-পশ্চিম হাওয়ার ঝাপটা নেই, অথচ তীক্ষ্ণ শীতের স্পর্শ অনুভব করছি। নিচে থেকে, এবং এই পুবের মহলে পায়রাদের বক্ বকুম শুনতে পাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে একটা শাস্তির মত মনে হচ্ছে।

আজই আমার কলকাতা রওনা হয়ে যাবার কথা ছিল। আগামী সপ্তাহের শেষে, সেখানে একটি অনুষ্ঠান আছে। পরের সপ্তাহে বম্বে, বম্বে থেকে ভূটান, ব্যাঙ্গালোর। ব্যাঙ্গালোর থেকে দিল্লী হয়ে আবার কলকাতা। এক মাসের সমস্ত অনুষ্ঠান-সূচী ঠিক হয়ে আছে।

আজই কলকাতা না ফিরতে পারাটা আমার কাছে শাস্তি মনে হচ্ছে না। শাস্তি মনে হচ্ছে এ বাড়ির এই একাকীত্বকে। অথচ একাকী

জীবনেই আমি স্বস্তি বোধ করি, কারণ পরিপূর্ণতার কোন পন্থা আমার জানা নেই। কিন্তু এখানে এই একাকীত্বের অনুভূতি অতিমাত্রায় তীব্র হয়ে উঠেছে, এবং নিজের কাছে অস্বীকার করতে পারি না, তার এক-মাত্র কারণ শান্তা।

শান্তা শিষ্ট, ওর সহবতের তুলনা নেই, আচরণে কোন ত্রুটি নেই। ওস্তাদজীর গ্রাম থেকে ফেরবার সময়, ওর সঙ্গে আমার দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে। আমার সন্দেহ হয়েছিল, ওর চোখে জল না থাকলেও, কান্নার আভাস ছিল। কান্নার পরে চোখ যেমন আরক্ত থাকে, সেই রকম। বিষণ্ণ ছিল ওর মুখ। আমার দিকে তাকিয়েছিল করুণ চোখে। কেন, কিছুই বুঝতে পারিনি। শান্তা আমাকে ওর নির্বাক নির্বিকারত্ব দিয়ে, ব্যাকুলই বেশি করেছে।

আমি আশা করি না, শান্তা আমাকে সঙ্গ দিতে আসবে: কিন্তু ত্রিপুরারি কোথায়? তিনিই বা আমাকে এই অপরিচিত বিশাল পুরীর এক কোণে এমন নির্বাসিত করে রেখেছেন কেন? শান্তা-রহস্যের ব্যাপারেও, তিনি নির্বাক কেন?

এই সময়ে রঘু এসে জিজ্ঞেস করল, 'বাবুজী, আপনি কি এখন আর একটু চা খাবেন?'

এই ঘনায়মান শীতের সন্ধ্যায়, একলা চায়ের পেয়ালা নিয়ে বসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার ছিল না। বরং বিরক্ত বোধ করে বললাম, 'না, কিছুই চাই না। আমি একটু বেরোব।'

রঘুর চোখে আমার বিরক্তি এড়িয়ে যায়নি। সে একটু অস্বস্তি নিয়ে আমার সামনে থেকে সরে গেল। আমিও শালটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। মাঝের ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ির দিকে এগোতেই, দেখতে পেলাম, পশ্চিমের কাঠের পার্টিশনের আড়াল থেকে শান্তা বেরিয়ে আসছে। ওদিকটায় এখনো আলো জ্বলেনি। আবছায়ায় দেখলাম, শান্তার গায়ে যেন হলুদ শাড়ি, আর একটি কালো শাল দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে, ঘাড়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে। ও

আমাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

শান্তা আমার দিকে এগিয়ে এল, যা আমার কাছে আশাতীত মনে হল।

বললাম, 'একলা ভাল লাগছিল না, তাই একটু বেরোচ্ছিলাম।'

শান্তা আমাকে অবাক করে দিয়ে বলল, 'মাতঙ্গীর মন্দিরে যাবেন ?'

আমি ওর চোখের দিকে একবার দেখলাম। এই প্রথম আমি ওর চোখে-মুখে একটু উৎসাহের আভাস দেখলাম। এমন কি ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যাবেন ?'

শান্তা যেন আমাকে ডাক দিয়ে বলল, 'চলুন যাই।'

চওড়া কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমরা পাশাপাশি নামলাম। আর সেই মুহূর্তেই শাঁখ বেজে উঠল, এবং তারপরেই ঢাকের সঙ্গে কাঁসি ও ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দ বেজে উঠল। গতকালও বেজেছিল। মাতঙ্গীর সান্ধ্যপূজা ও আরতি হচ্ছে। কিন্তু আমার সমস্ত আগ্রহের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি যেন বিঁধে রইল। শান্তার এই আচরণটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।

চারদিকে নিঝুম, লোকজন বিশেষ কারোকে দেখতে পেলাম না। শান্তা আমার পাশে পাশেই চলতে লাগল। বিস্ময় আর অস্বস্তির মধ্যেও, একটা আকস্মিক খুশি অনুভব করলাম। ও যে এত সহজে আমার কাছে আসতে পারে, তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ত্রিপুরারিবাবু কোথায় ?'

'উনি এখন মন্দিরেই হয়তো আছেন।' শান্তা স্বাভাবিক ভাবে জবাব দিল।

অনেক কথাই আমার ঠোঁটের কাছে হুড়মুড় করে এগিয়ে এল। নানা কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা। কিন্তু আমি কিছুই বলতে পারলাম না। মাতঙ্গীর মন্দির চত্বরে প্রবেশের মুখে, ঘন এবং নিবিড় গাছপালা ছড়ানো বাগানে আমরা এসে পড়লাম। সেখান থেকেই মন্দিরের আলোকিত চত্বর দেখতে পাওয়া যায়।

মন্দিরে প্রবেশের দেউড়ির দুই পাশে দুই পাথরের দ্বারী মূর্তি, মাথার ওপরে দুদিকে দুই পাথরের সিংহ। সিংহ-দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে, মন্দিরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, স্বয়ং ত্রিপুরারি রেশমি কাপড় পরে আরতি করছেন। পূজারী ব্রাহ্মণ পাশে দাঁড়িয়ে, আরতির বিভিন্ন উপকরণ তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছে। মন্দিরের নিচে, একপাশে ঢাকি দু'-জন ঢাক বাজাচ্ছে। একজন স্ত্রীলোক কাঁসি বাজাচ্ছে। বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে একজন, মন্দিরের দরজার মাথার ওপরে ঝুলন্ত ঘণ্টার দড়ি ধরে, তালে তালে টানছে।

মন্দিরের চারপাশেই বারান্দা, এবং বারান্দা সংলগ্ন ঘর। বাঁ দিকের কোণে আমি ভৈরবের মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। শান্তা চত্বরে নেমেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ত্রিপুরারিবাবু আরতি করছেন?'

'রোজই করেন।' শান্তা জবাব দিল।

আমি বললাম, 'কিন্তু গতকাল তো তিনি এ সময়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন?'

'আপনার সম্মানে ছিলেন।' শান্তা বলল, 'গতকাল পূজারী ঠাকুর আরতি করেছেন। চলুন, সামনে যাই।'

আমরা মন্দিরের আরো কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম চত্বরের আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কিছু নারী-পুরুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই পূজা-আরতি শেষ হল। পূজারী ঠাকুর সবাইকে ফলমূল এবং তিলের মিষ্টি বিতরণ করলেন। আমাদেরও দিলেন। ত্রিপুরারি বেরিয়ে এলেন বারান্দায়, আমাদের দিকে দেখে, হেসে বললেন, 'তুমি এসেছ? শোন্ শান্তা, বিশ্বরূপকে নিয়ে গিয়ে দক্ষিণের কোণের ঘরে বোস্। দ্যাখ্, ও ঘরের দরজা খোলাই আছে, আলোও জ্বলছে। আমি এই কাপড়-চোপড় ছেড়ে আসছি।'

শান্তা আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

ওকে অনুসরণ করে, পিছনে ফিরে গিয়ে, দক্ষিণের কোণের কাছে

সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠলাম। শান্তা সামনের ঘরের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখলাম, একপাশে একটি ছোট তক্তপোশ, তার ওপরে সাধারণ একটি কম্বল পাতা। নিচে চাদর বিছানো গদী, এবং তাকিয়া। তক্তপোশের ওপর রয়েছে তানপুরা, হারমোনিয়ম, তবলা। শান্তা ঘরের মধ্যে ঢুকে, আমাকে ডাকল, 'আসুন, বসুন।'

কেন যেন মনে হল, সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব-পরিকল্পিত। আমাকে শান্তার ডাকতে যাওয়া, মাতঙ্গীর মন্দিরে নিয়ে আসা এবং তারপরে এই ঘরে। শান্তা আমাকে গদীর দিকে দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

আমি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললাম, 'বসছি। আপনিও বসুন।'

শান্তা হেসে বলল, 'আপনি আমাকে "তুমি" করে বলুন।'

আমি ওর দিকে তাকালাম, ওর চোখের দৃষ্টি আমার প্রতি। আবার বলল, 'আপনি আমার কাছে গুরুজন-তুল্য। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

শান্তার সমস্ত কথাই যেন আমার মনে তরঙ্গ তুলল। ও বয়সের তুলনা দিল না। কিন্তু গুরুজন কেন? কোন্ হিসাবে? বৃথাই মনের জিজ্ঞাসা। আমি মুগ্ধচোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই বলব। তুমিও বসো।'

শান্তা পিছনে পা রেখে, জানু পেতে বসল। হলুদ শাড়ির ওপরে, কালো শালের ঘোমটায় ওকে অপরূপ দেখাচ্ছে। এ নিতান্ত রমণীর সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশের কথা বলছি না। হলুদ এবং কালো এবং ওর ফরসা মুখ, কালো চোখ, গভীর দৃষ্টি, ঈষৎ হাসি সব মিলিয়ে, ওকে যেন কেমন অবাস্তব এবং দূরের মনে হচ্ছে, যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে!

আমি একপাশে বসলাম। আর এই মুহূর্তেই ত্রিপুরারি এলেন। এখন ধুতি-পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়ানো ওঁর গায়ে। কপালে একটি সিঁদুরের তিলক। হাতে ছড়ি নেই। ঘরে ঢুকে পায়ের জুতো খুলে বললেন, 'বিশ্বরূপ, একটু গান হলে কেমন হয়?'

শান্তার গান শোনবার উৎসাহে বললাম, 'ভালই হয়।'

শান্তা আমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনি গান করুন।'

'আমি? আমি তোমার গান শুনতে চাইছি।' আমি বললাম।

শান্তা বলল, 'আজ আপনি শুরু করুন, আমি পরে গাইব।'

'ঠিক।' ত্রিপুরারি বললেন, 'গতকাল শান্তা শুরু করেছিল, বিশ্বরূপ আসরে গিয়ে গেয়েছিলে। আজ তুমিই শুরু কর।'

অস্বীকার করব না, গতকাল গানের সুর শান্তাই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে একজন দুটো কাঠের আগুনের আংটা নিয়ে ঢুকে, ঘরের দুই কোণে বসিয়ে দিল। ত্রিপুরারি গদীর ওপরে উঠে সেই লোকটির উদ্দেশে বললেন, 'নাগিন, হারমোনিয়মটা ডুগি-তবলা আর তানপুরা এখানে নামিয়ে দে।'

শান্তা আগেই তানপুরা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আমাকে বলল, 'আমি তানপুরা বাঁধছি, আপনি হারমোনিয়মটায় আওয়াজ দিন।'

ত্রিপুরারি টেনে নিলেন ডুগি-তবলা। পূজারী ঠাকুর এলেন ঘরের মধ্যে। তার হাতে একটি চকচকে মাটির ভাঁড়, আর দুটি নারকেলের মালা। পিছনে আর একটি লোক। তার হাতের কলাপাতায় কিছু খাদ্যসামগ্রী রয়েছে মনে হল। সবই তক্তপোশের ওপর রক্ষিত হল। মাটির ভাঁড় থেকে যে-গন্ধ বেরোচ্ছে দ্রব্য চিনতে ভুল হল না। কিন্তু এই দেশীয় মদ্য এখানে কেন?

ত্রিপুরারি বোধ হয় আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, বললেন, 'এসব হল মাতঙ্গীর প্রসাদ। বিশেষ পরিবারের হাতে তৈরি কারণবারি দিয়ে মাতঙ্গীর পূজা হয়। দোকানের কেনা মদ এখানে আসে না। রঘু তোমার জন্য হুইস্কির বোতল নিয়ে আসবে।'

আমি ব্যস্তভাবে বললাম, 'না না, আমার এখন এ সবের কোন দরকার নেই।'

পূজারী ইতিমধ্যেই, চাঁছা-ছোলা ঝকঝকে একটি নারকেলের মালায় ভাঁড় থেকে কারণবারি ঢেলে, ত্রিপুরারির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ত্রিপুরারি দু হাতে মালা ধরে এক চুমুকেই তা পান করে, মালাটি ফেরত

দিলেন। পূজারী মালা রেখে, কলাপাতা বাড়িয়ে ধরলেন। দেখলাম সেগুলো চিঁড়ে-ভাজা ছাড়া কিছু না। ত্রিপুরারি একমুঠো নিয়ে মুখে দিলেন।

আমার চোখ পড়ে গেল শান্তার ওপর। শান্তা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'মায়ের প্রসাদ খাবেন না?'

আমি অবাক হয়ে শুনলাম, তার স্বরের মধ্যে যেন একটা প্রচ্ছন্ন অনুরোধ। কিন্তু কোন্ প্রসাদের কথা বলছে ও? শান্তা পূজারীর দিকে ফিরে হিন্দীতে বলল, 'বাবুজীকো প্রসাদ দিজিয়ে ঠাকুরজী।'

পূজারী আর একটি মালায় কারণবারি ঢেলে, আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি একবার শান্তা, আর একবার ত্রিপুরারির দিকে দেখলাম। ত্রিপুরারি বললেন, 'এক ঢোকে খাও, সেটাই নিয়ম।'

আমি আর একবার শান্তার দিকে তাকিয়ে, হাত বাড়িয়ে নারকেলের মালাটি নিলাম। যেন নরকরোটির মতই। এক ঢোকে পান করলাম। যতটা গলায় লাগবে ভেবেছিলাম, তার থেকে কমই লাগল। পূজারী কলাপাতা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। আমি একমুঠো চিঁড়ে-ভাজা মুখে দিলাম। মনে হল চিঁড়ে-ভাজা এখনো গরম। শান্তাও এক-মুঠো চিঁড়ে-ভাজা নিয়ে মুখে দিল। তারপরে তানপুরার তারে আঙুল চালিয়ে ঝঙ্কার তুলল। আমি হারমোনিয়মে আওয়াজ দিলাম। ত্রিপুরারি তবলা ঠুকতে আরম্ভ করলেন। বাকিরা সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল। আংটার কাঠকয়লার অঙ্গারের উত্তাপ ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

উত্তাপ ছড়াতে লাগল আমার মধ্যেও। শান্তা খুব তাড়াতাড়ি তানপুরা বাঁধল। আমি হারমোনিয়ম ছেড়ে দিয়ে তানপুরায় গলা দিলাম। কিছু না ভেবে না চিন্তা করেই, হোরি ধামারের সুর আমার গলায় ভর করল। বোল, গৎ, গতভাওয়ের মুখে, আমার সঙ্গে শান্তা ওর গলা দিল। ত্রিপুরারি তবলায় চাঁটি দিলেন। আমি শান্তার স্বর আমার স্বরের মধ্যে একাত্ম হয়ে যেতে শুনলাম, আর এক

আনন্দানুভূতিতে, আমি আমার নিজের গানেই ডুবে যেতে লাগলাম।

লয়ের মুখে এসে, শান্তা আর আমি, একই দ্রুত গৎকে, ভাগে ভাগে নিয়ে গাইলাম। ত্রিপুরারির চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে আশ্চর্য ছটা। তিনি আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়েই ঘাড় ঝাঁকাচ্ছিলেন।

এক সময়ে আমার গান শেষ হল। সহসা চারদিক যেন অতি স্তব্ধ মনে হল। ত্রিপুরারি আবেগের সঙ্গে বললেন, 'চমৎকার! নাসিরার দৌলত।'

শান্তা ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে ত্রিপুরারির দিকে তাকাল। ত্রিপুরারি হাসলেন। শান্তার ভুরু কুঁচকে উঠল। ত্রিপুরারি হেসে বললেন, 'তুই অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? আমি কি মিথ্যা বলেছি? দে, তুই আমাকে একটু মায়ের প্রসাদ দে।'

শান্তার মাথা থেকে, কালো শাল লুটিয়ে পড়েছিল গদীর ওপর। দুজনের মধ্যে কী কথা হল, বুঝলাম না। আমি আবার কৌতূহলিত হলাম, ত্রিপুরারির সঙ্গে শান্তার কী সম্পর্ক? কথাটা ভাবা মাত্রই, আমি যেন ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠলাম। এখনো জানতে পারলাম না, আনিসা বেগমের সঙ্গেই বা শান্তার কী সম্পর্ক?

শান্তা নারকেলের মালায় কারণবারি ঢেলে ত্রিপুরারিকে দিয়ে, আমার দিকে তাকাল। এই সময়ে রঘু হুইস্কির বোতল গেলাস নিয়ে ঢুকল। শান্তার ঠোঁটের কোণে হাসি, জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌টা নেবেন?'

আমি বললাম, 'যা দিয়ে শুরু করেছি।'

ত্রিপুরারি হেসে বলে উঠলেন, 'নাসিরার দৌলত। প্রসাদই খাবে ও।'

রঘু হুইস্কির বোতল গেলাস রেখে বেরিয়ে গেল। শান্তা নারকেলের মালায় কারণবারি ঢেলে আমাকে দিল। আমি নিতে গিয়ে ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখ নত। আমার বুকের মধ্যে শিহরিত হল। আমার চোখের সামনে এক তওয়ায়েফ রমণীমূর্তি ভেসে উঠল, যার মুখোমুখি ওস্তাদজী বসে আছেন।

ত্রিপুরারি বললেন, 'বিশ্বরূপ, এবার তুমি শান্তার জন্য তানপুরা বাঁধো।'

আমি এক চুমুকে কারণবারি পান করে, নারকেলমালা রেখে দিয়ে, তানপুরা টেনে নিলাম। শান্তা হারমোনিয়মে সুর দিল। ত্রিপুরারি তবলা ঠুকলেন। তারপরে শান্তা, প্রথম থেকেই আজ ঠুংরি ধরল, হিন্দী থেকে যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'ছেড়ে দাও হে কানাই, কী কারণে আমার পথরোধ করো?'···

ত্রিপুরারি প্রথম থেকে সঙ্গত শুরু করলেন। গানটি আমার জানা, ওস্তাদজীর কাছেই শেখা, তবে নাচের সঙ্গে এ গান অনেক সঞ্চারীতে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু শান্তার গলায় এ গান আমার কাছে অন্যভাবে অর্থময় হয়ে উঠল। যথেষ্ট সহবতের সঙ্গেই, ও ওর একমাত্র অলঙ্কার হীরার নাকছাবিটিতে ঝিলিক দিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে মাঝে মাঝে ব্যথা-কাতরতা প্রকাশ করল, এবং পরিহাস করে হাসল।

হোরি ধামারের রেশ আর রইল না, ঠুংরি প্রাণ-মনকে ভিন্ন জগতে নিয়ে গেল। শান্তা পর পর দুটি ঠুংরি গাইল, দেড় ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। গান শেষ করেই, শান্তা উঠে দাঁড়াল, এবং এই প্রথম উচ্চারণ করল, 'বাবা, আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'যাবি?' ত্রিপুরারি যেন একটু দ্বিধা করলেন।

শান্তা আমার ব্যাকুল চোখের দিকে তাকিয়ে, ঘাড় কাত করে বলল, 'যাচ্ছি, কেমন?' এবং কোনরকম সম্মতির অপেক্ষা না করেই, ওর কালো শালটি তুলে নিয়ে চলে গেল।

কতক্ষণ বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়েছিলাম, জানি না। সচকিত হলাম ত্রিপুরারির কথায়, 'মেয়েটিকে কী রকম বুঝছ হে বিশ্বরূপ?'

অন্ধকারে শেষ আলোর রেখার মত, তখনো আমার মনে আনন্দ স্পর্শ করে ছিল, অতএব লজ্জা পাবার কোন অবকাশই পেলাম না। বললাম, 'বুঝিয়ে বলা সম্ভব না।'

'বুঝেছি।' ত্রিপুরারি বললেন, এবং ডাকলেন, 'রঘু।'

মুহূর্তেই রঘু দরজায় আবির্ভূত হল। ত্রিপুরারি হিন্দীতে বললেন, 'আমাদের একটু মায়ের প্রসাদ দে। আর তুই এখানেই থাক। আমাদের প্রসাদ ঢেলে ঢেলে দিবি।'

রঘু আমাদের নারকেলের মালায় কারণবারি দিল। এক চুমুকে পাত্র শেষ করে ফিরিয়ে দিলাম, এবং আমি ত্রিপুরারির দিকে তাকালাম। ত্রিপুরারি তাঁর অতি আয়ত আরক্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, বললেন, 'তোমার কথার জবাব চাইছ, না? জবাব তো তুমি আন্দাজ করেই নিতে পারো।'

'আন্দাজ করে নিতে পারি?' আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

ত্রিপুরারি বললেন, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য মিলটা তো তুমি ধরতেই পেরেছ। শান্তা আনিসার মেয়ে।'

'আনিসা বেগম? তয়ফাওয়ালী?' আমি যেন সব বুঝেও বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ত্রিপুরারি রঘুকে প্রসাদ দেবার ইশারা করে বললেন, 'হ্যাঁ। নাসিরা এই কন্যা আমাকে দিয়ে গেছে।'

'ওস্তাদজী?' আমি বিভ্রান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

ত্রিপুরারি প্রসাদ পান করে বললেন, 'হ্যাঁ। শান্তা নাসিরার মেয়ে। ওর মায়ের নাম মেনকা, যাকে তুমি আনিসা বেগম বলে জান। তাহলে তোমাকে অনেক কথা বলতে হয়।'

ত্রিপুরারি পাত্রের পর পাত্র প্রসাদ পান করে যা বললেন, তার মর্মার্থ, অলখিয়া প্রকাশজী তাঁর সাধক জীবনে এক রমণীর সঙ্গলাভ করেন, যিনি তাঁর ছাত্রী ছিলেন। নাম ছিল বিন্দুবালা। বিন্দুবালার সন্তান মেনকা। বিন্দুবালা পরবর্তী জীবনে আর কখনো গুরুজীর কাছে থাকেননি। কন্যা কিছু বড় হওয়ার পরে, কোথায় চলে যান, কেউ জানে না। সেই সময় গুরুজীর জীবনে একটা সংকট আসে। কাটিয়েও

ওঠেন, আর তারপর থেকেই তাঁর সঙ্গীতের সাধনা আর খ্যাতি বেড়ে যায়। এই বাড়িতে, মেনকাকে নিয়ে তিনি আসতেন। ত্রিপুরারি এবং নাসিরুদ্দিনের থেকে প্রায় বারো বছরের ছোট ছিল মেনকা। কিন্তু পাল্লা দিত সমানে।

মেনকা নাসিরুদ্দিনের প্রেমে পড়েছিল। তার ফল শান্তা। কিন্তু মেনকার মধ্যেও ওর মায়ের বৈপরীত্য ছিল। সে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও, নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে ঘর করেনি। তার স্তাবকের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। সে বাঈজীর জীবিকা বেছে নিয়েছিল। ত্রিপুরারির ভাষায়, 'নাসিরা সারা জীবনে যত মেয়েকেই ভোগ করে থাকুক, চিরদিন মেনকার জন্যই মনে মনে গুমরে মরেছে। মেনকা—মানে আনিসা, যে কলকাতায় ছিল, তা নাসিরার করজোড় ভিক্ষায়, যেন মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পায়।'

সব কথা শুনতে শুনতে আমার চোখের ওপর থেকে অনেক দিনের পুরনো পর্দাই শুধু সরে গেল না, মুহূর্তেই আমি আবিষ্কার করলাম, অল্‌খিয়া প্রকাশজী, নাসিরুদ্দিন আহ্‌মেদ খান থেকে জীবনের একই স্রোতের ধারা যেন আমাকে এখানে ভাসিয়ে নিয়ে এনেছে। বিন্দুবালা আর মেনকা থেকে প্রবাহিত সেই স্রোতস্বিনীর নাম এখন শান্তা।

আমি কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলাম, জানি না। ত্রিপুরারি আমার কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, 'বিশ্বরূপ, জ্বলন্ত প্রাণটা জলে ভিজে উঠেছে, না?'

আমার বুকের মধ্যে শিহরণ খেলে গেল। আমি ত্রিপুরারির পায়ে হাত স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন, 'বুঝেছি। সেই জন্যই তো তখন বলছিলাম, নাসিরার দৌলত। তুমি তোমার আনন্দের স্বরূপকে অনুভব করেছ। তাই বলে রাখছি, এই মাতঙ্গী বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরদিনের জন্য খোলা থাকল। যখন যেখান থেকে ইচ্ছে, এখানে ছুটে এসো। শান্তা সুখের সন্ধান করেনি, পার্থিব কোন সুখের বাসনা ওর নেই। ও ওর মা-দিদিমাকে অনুসরণ করবে না। জীবন আর

মনকে ও তৈরি করে নিয়েছে। তোমার গান শান্তার রক্তে আছে, ও তো নাসিরার মেয়ে। দুঃখীরা মিলিত হলে, আনন্দিত হয়।'

ত্রিপুরারি সহজভাবে কথাগুলো বললেন, কিন্তু আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। আমি ওঁর পা থেকে হাত তুলে মাথায় ছোঁয়ালাম।

॥ শেষ